৭.০৫ বনহুর ও হাঙ্গেরী কারাগার – Bangla Library

৭.০৫ বনহুর ও হাঙ্গেরী কারাগার – Bangla Library

বনহুর ও হাঙ্গেরী কারাগার–১০৫

বনহুরের হাত দুখানা যদিও উপরের দিকে টেনে বাঁধা ছিলো তবু সে নিস্তেজ হয়নি বা মুষড়ে পড়েনি। তার দক্ষিণ হাতের আংগুলে একটা আংটির মধ্যে বসানো রয়েছে ক্ষুদে ওয়্যারলেস। বনহুর তার দক্ষিণ হাতখানাকে একবার সম্মুখে আনতে পারলেই তার উদ্দেশ্য সফল হবে। তাই সে নানাভাবে চেষ্টা করছিলো শৃংখলাবদ্ধ হাতখানাকে কোনোক্রমে মুখের সম্মুখে আনতে পারা যায় কিনা।

পা দুখানাও তার মুক্ত ছিলো না।

মোটা শিকলে পা দুখানাও শক্ত করে বাঁধা রয়েছে।

বনহুর ভাবছে তাকে নূর ছাড়া কেউ এখন বন্দী করতে সক্ষম হতো না।

একটু হাসলো বনহুর।

শেষ পর্যন্ত পুত্রহস্তে বন্দী হলো সে।

অবশ্য এমন একটা ঘটনা ঘটবে আগে থেকেই কিছুটা আঁচ করে নিয়েছিলো বনহুর। আজ যেন সে অনেকটা নিশ্চিন্ত, কারণ একটা দুর্বলতা প্রায়ই বনহুরকে গভীরভাবে চিন্তিত এবং বিচলিত করতো। নূর প্রখ্যাত গোয়েন্দা হয়ে ফিরে আসার পর সে দস্যু বনহুর গ্রেপ্তারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিলো। বনহুর আরও জানতো নূরকে এ ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করছিলেন প্রবীণ ডিটেকটিভ শংকর রাও এবং মিঃ হারুন।

মনস্কামনা তাদের সফল হয়েছে। নূরকে তারা নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, উদ্দেশ্য পুত্র দ্বারা পিতাকে গ্রেপ্তার করানো। তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

মিঃ হারুন এবং শংকর রাও অনেকে চেষ্টা করে অতি সাবধানে নূরের কাছে গোপন রেখেছিলেন বনহুরের পরিচয়, কোনোক্রমে সে যেন জানতে না পারে বনহুর তার পিতা। তারা জানতেন বনহুর সম্বন্ধে পুলিশ রিপোর্টগুলো সরিয়ে রাখলেই নূর কিছুতেই জানতে পারবে না তার আসল পরিচয়। তারা আরও জানতেন মাত্র কয়েকজন পুলিশপ্রধান ছাড়া এ কথা সাধারণ জনগণ জানে না, তাই মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও নিজেদের প্রচেষ্টাকে সফলকাম করতে পেরেছেন। শুধু তাই নয়, তারা আরও জানতেন চৌধুরীবাড়ির কেউ বনহুর সম্বন্ধে নূরের কাছে কিছু ব্যক্ত করেনি এবং কোনোদিন করবে না।

এ ভরসা নিয়েই পুলিশমহলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বিপুল উৎসাহ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং জয়যুক্তও হয়েছেন।

বিচারে বনহুরকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হবে।

এবং তা হবে হাঙ্গেরী কারাগারের ভূগর্ভস্থ অন্ধগুহায়।

পুলিশমহলে এ ব্যাপার নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়ে গেলেও জনসাধারণ জানে না। অবশ্য একথা জনগণ যাতে জানতে না পারে সেজন্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিলো।

জনগণ কিন্তু বনহুর গ্রেপ্তার হওয়ায় মোটেই খুশি হতে পারেনি, কারণ বনহুর কোনোদিন সাধারণ মানুষের কোনো ক্ষতি সাধন করেনি। তারা বনহুরকে ভালবাসে বরং তাকে দেখবার জন্য বিপুল একটা আগ্রহ সব সময় তাদের মনে জাগরিত রয়েছে। এক দিন ছিলো যেদিন বনহুরের নামে সবাই শিউরে উঠতো, আতঙ্কে কুঁকড়ে যেতো, আজ সে আতঙ্ক আর ভীতিভাবে কেটে গেছে। সবাই জানে এবং অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছে দস্যু বনহুর মহৎ মহান ব্যক্তিদের বন্ধু আর যারা অসং স্মাগলার তাদের শত্রু। কাজেই দেশের একশ্রেণীর কিছু সংখ্যক অসৎ লোক ছাড়া বনহুর বন্দী হওয়ায় আর সকলে খুশি হতে পারেনি বরং ব্যথিত হয়েছে।

যদিও প্রকাশ্যে কেউ বনহুর সম্বন্ধে কিছু বলতে সাহসী হয়নি, কারণ পুলিশমহল বা সরকার যা ভাল মনে করছেন তার বিরুদ্ধে বলা সমীচীন নয়।

এক শ্রেণীর ব্যক্তি খুশিই শুধু হয়নি, তারা আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে। এখন তারা নিশ্চিন্ত মনে করছে নিজেদের কুকর্ম। ইচ্ছামত ব্যবসার উন্নতি সাধনে তারা এগুতে পারবে।

পুলিশমহলকে ফাঁকি দেওয়ার অনেক পথ তাদের সম্মুখে খোলা আছে এবং এ ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতাও কম নেই।

কান্দাই শহরের গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি তারা, সময় অসময়ে তাদের ডাক আসে বিদেশ থেকে। বিদেশীরা তাদের সম্মান দেয় যথেষ্ট, কারণ এর পেছনে আছে প্রচুর স্বার্থসিদ্ধির উপায়।

মাঝেমধ্যে পুলিশ অফিসে এই মহান ব্যক্তিদের আনাগোনা যে ঘটতো না তা নয়, এবং সময়মত অনেক গোপন কথা জেনে নেবার চেষ্টা করেন। তবে পুলিশমহলের নেতৃস্থানীয় যারা, তারাও কম ঘুঘু নন, তাঁরাও মানুষ চেনেন, মুখে সম্মান দেখালেও অন্তরে যে ঘৃণা পোষণ করেন তা সুনিশ্চি।

যাক এসব কথা, এবার আমরা হাঙ্গেরী কারাকক্ষে ফিরে যাই। বনহুর তারা হাতের শিকল কিছুমাত্র শিথিল করতে পারলো না। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন সশস্ত্র প্রহরী কারাকক্ষের দরজায় এসে দন্ডায়মান হলো।

বনহুর তখন মুখটা ফিরিয়ে দাঁড়াল। যেন প্রহরী বুঝতে না পারে বন্দী তার হাতের বাঁধন লঘু করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

একটা শব্দ হলো।

বনহুর বুঝতে পারলো দরজার তালা খোলা হচ্ছে। তাকালো বনহুর কারাগারের দরজার দিকে।

তার অনুমান সত্য।

দরজা খুলে প্রহরী প্রবেশ করলো কারাগারকক্ষে। সাথে হাতে কিছু খাবার নিয়ে অপর একজন। বনহুর ভাল করে লক্ষ্য করলো। কারণ আজ কদিন যাবৎ তাকে এভাবে ঝুলন্ত অবস্থায়। শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, শুধু সকালে তাকে তার কিছু নিজস্ব প্রয়োজনে কারাকক্ষের বাথরুমে নিয়ে যাওয়া হয়। ফিরে এলে পুনরায় শৃখলাবদ্ধ করা হয়। খাবার তেমন কিছু দেওয়া হয়নি বা হয় না শুকনো দুখানা রুটি ছাড়া, তাও ঐ মুহূর্তে যে মুহূর্তে তার হাতের শিকল কিছু হালকা করা হয়।

হঠাৎ অসময়ে খাবার নিয়ে প্রহরী একেবারে কারাকক্ষে প্রবেশ করলো– বিস্ময়কর বটে। বনহুর চোখ তুলে তাকালো।

বনহুর ক্ষুধার্ত এ কথা তারা জানতো। প্রহরী তার সঙ্গীকে খাবারের থালাটা বন্দীর মুখের কাছে তুলে ধরার জন্য ইংগিত করলো।

প্রহরী সঙ্গীর আদেশমত কাজ করলো।

থালাটা মুখের কাছে তুলে ধরলে বনহুর মাথা নিচু করে খাবার মুখে গ্রহণ করার চেষ্টা করলো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খাবারের থালা ছুঁড়ে ফেলে দিলো প্রহরী।

খাবারের থালাটা পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে খাবারগুলো ছড়িয়ে পড়লো মেঝেতে।

প্রহরী বললো, ঐ ধূলোমাখা খাবারগুলো তুলে পুনরায় বন্দীর মুখে দাও।

প্রহরী সঙ্গীর হুকুমমত মেঝেতে ছড়ানো খাবারগুলো কুড়িয়ে নিয়ে পালায় জড়ো করতে শুরু করলো, সেই ফাঁকে প্রহরী বনহুরের শিকলপরা হাত দুটির

তালা খুলে দিলো চাবি লাগিয়ে।

একটুও টের পেলো না প্রহরীর সঙ্গীটি, সে খাবার তুলে নিয়ে পালাসহ মুকে ধরলো বন্দীর।

বনহুর বুঝতে পারলো, যা সে অনুমান করেছিলো তা সত্য। তরুণ প্রহরীর বেশে অন্য কেউ নয়– হাভেদ। বনহুরের হাত দুখানা মুক্ত হয়নি, শুধু তালাটা খুলে দিয়েছিলো প্রহরীবেশী জাভেদ।

নিশ্চুপ রইলো বনহুর।

তারই সন্তান নূর তাকে বন্দী করেছে আবার তারই অপর সন্তান তাকে মুক্ত করছে....একটু হাসলো বনহুর।

জাভেদ ও তার সঙ্গী ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে বাইরে। কারাগারের কপাট যেমন খুলে গিয়েছিলো তেমনি পুনরায় বন্ধ হলো।

হঠাৎ আলো নিভে গেলো। হাঙ্গেরী কারাগারের ভূগর্ভ অন্ধকারাগার ভরে গেলো অন্ধকারে।

বনহুর দ্রুতহস্তে শিকল খুলে ফেললো এবং হাতখানা মুখের সামনে টেনে নিয়ে আংটির ক্ষুদে ঢাকনা খুলে চাপাকণ্ঠে কিছু আলাপ করলো আস্তানার নওশের আলীর সঙ্গে। কয়েক সেকেন্ড মাত্র আলাপ হলো তারপর বনহুর অন্ধকারেই পুনরায় হাত দুখানায় শিকল জড়িয়ে হাত দুখানাকে উর্ধমুখী করে দাঁড়িয়ে রইলো ঠিক আগের মত করে।

আলো জ্বলে উঠলো।

পাহারাদার সূতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো বন্দীর দিকে, বন্দী ঠিক অবস্থায় আছে কিনা।

এ পাহারাদার শুধু পাহারার কাজ করে, সে কারাকক্ষে কোনো সময় প্রবেশ করে না। যে প্রহরী কারাকক্ষে প্রবেশ করে সে আলাদা ব্যক্তি।

জাভেদ সেই প্রহরীর বেশ ধারণ করেই বনহুরের কারাকক্ষে প্রবেশ করার সুযোগ করে নিয়েছিলো।

ফিরে আসে জাভেদ তার অশ্বের পাশে।

রহমান এবং অনুচরদ্বয় তখনো ফিরে আসেনি।

জাভেদ তাজের পিঠ চাপড়ে বলে–আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে তাজ।

তাজ জাভেদের কথা যেন বুঝতে পারলো, সে চিহি শব্দ করে সম্মতি জানালো।

এমন সময় রহমান ও অনুচরদ্বয় ফিরে এলো। তাদের দেহে তখনও হাঙ্গেরী কারাগারের পুলিশ প্রহরীর ড্রেস। রহমান ভিক্ষুক বেশে সজ্জিত হয়েছিলো, এখন তার মুখে হালকা দাড়ির আভাস বিদ্যমান।

রহমান ও অনুচরদ্বয় এসে পৌঁছতেই জাভেদ অশ্বপৃষ্ঠে উঠে বসলো এবং রহমান ও অনুচরদ্বয়কে নিজ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে উঠে বসার জন্য নির্দেশ দিলো।

রাতের অন্ধকারে অন্তর্ধান হলো ওরা।

*

আজ রাত তিনটায় দস্যু বনহুরকে তার কারাগারের সেলে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হবে। কথাটা শুধু পুলিশমহলেই আবদ্ধ থাকার বা রাখার চেষ্টা করা হলেও মোটেই তা রইলো না–প্রকাশ পেলো কান্দাই শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে।

কিছু লোক খুশি হলো আর সবাই দুঃখে মুষড়ে পড়লো, শেষ পর্যন্ত দস্যু বনহুরকে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হলো।

আবার অনেকের মুখেই শোনা গেলো যত সহজ মনে করা হচ্ছে তত সহজ নয় দস্যু বনহুরকে ফাঁসি দেওয়া। নিশ্চয়ই তার অনুচরগণ তাকে উদ্ধার করবে, নয়তো সে পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু বেরিয়ে আসার কোনো উপায় ছিলো না। এবার যে ভাবে পাহারাদারগণ সতর্কতার সঙ্গে বনহুরকে ঘিরে

রেখেছে তাতে তার হাঙ্গেরী কারাগার থেকে সরে পড়া বড় কঠিন ব্যাপার। এ ছাড়াও শিকল দিয়ে মজবুত করে তার হাত দুখানা বাঁধা। এমন কি পা দুখানাও তার শৃঙ্খলাবদ্ধ রয়েছে।

কান্দাইবাসী এবার বুঝতে পারলো বনহুরকে এবার মৃত্যুবরণ করতেই হবে। তারা বনহুকে আর জীবিত দেখতে পাবে না।

গোপনে তারা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো। অবশ্য কিছু লোক খুশি হলো।

সমস্ত দিনটা কেটে গেল।

যদিও হাঙ্গেরী কারাগারে রাত বা দিন বুঝবার যো নেই। কারণ হাঙ্গেরীর অভ্যন্তরে কোন দিন সূর্যের আলো প্রবেশে সক্ষম হয় না। জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই কারাগার।

বনহুরের সেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন দুজন পুলিশ কর্মকর্তা এবং দুজন অস্ত্রধারী পুলিশ।

সবার পেছনে যমদূতের মত দাঁড়িয়ে আছে যে বনহুরকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝোলাবে সে।

অন্ধকারে চোখ দুটো তার হত্যার নেশায় জ্বলছে।

কারাকক্ষের দরজা খুলে প্রবেশ করলো হাঙ্গেরী কারাগারের প্রধান রক্ষী এবং পুলিশপ্রধানদ্বয় ও তাদের সঙ্গী। কিন্তু আশ্চর্য কারাগারে প্রবেশ করার পর যখন বন্দী বনহুরকে স্পর্শ করলো তখন বিস্ময়ে হতবাক হলো সবাই। বনহুর নেই সেখানে, একটা কাঠের তৈরি মূর্তিকে হাত দুখানা শিকলে ঊর্ধ্বমুখী অবস্থায় আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গেরী কারাগারের বিপদসংকেতধ্বনি বেজে উঠলো।

সশস্ত্র পুলিশ প্রহরীদের হন্তদন্তভাবে ছুটাছুটি আরম্ভ হলো।

একটা বিস্ময়কর অবস্থার সৃষ্টি হলো মুহূর্তে।

কান্দাই পুলিশপ্রধান মিঃ আনসারী কোরেশীর গাড়ি এসে হাঙ্গেরী কারাগারে প্রবেশ করলো।

তিনি দলবলে হাজির হলেন কারাগারের বিভিন্ন ফটক পেরিয়ে সেই অন্ধকার কক্ষের সামনে। এই কক্ষে বন্দী ছিলো দস্যু বনহুর।

আশ্চর্য হলেন মিঃ কোরেশী, ঠিক দস্যু বনহুরের আকৃতির একটা কাঠের মূর্তি ঊর্ধ্ব হস্তদ্বয়ে শিকল আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। কেউ স্পর্শ না করলে বুঝতে পারবে না সেটা কোনো জীবিত মানুষ নয়।

মিঃ কোরেশী ও তার দলবল সমস্ত কিছু পরিদর্শন করে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, কারণ কারাকক্ষে খুব ভালভাবে কঠিন সতর্কতার সঙ্গে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। এতটুকু ফাঁক ছিলো না যেদিক দিয়ে বন্দী পালাতে পারে।

অনেক সন্ধান করেও কোন পথে বনহুর সরে পড়েছে তার কোনো হদিস খুঁজে পাওয়া গেলো না।

মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও সংবাদ শুনে হতবাক হলেন। ব্যতিব্যস্তহয়ে ছুটে গেলেন তারা হাঙ্গেরী কারাগারে। তাদের সব সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেলো। বহু কষ্টে, অনেক কৌশলে, নানা উপায়ে বনহুরকে তারা ডিটেকটিভ নূরকে দিয়ে আটক করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কথাটা শোনার পর মাথায় যেন বাজ পড়েছিলো তাদের। হাঙ্গেরী কারাগারে পৌঁছে তারাও অবাক হলেন। একি আশ্চর্য ব্যাপার, দস্যু বনহুর এমনভাবে কোথায় উবে গেলো?

মিঃ শংকর রাও কারাকক্ষটি ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। শুধু শংকর রাও নন, অন্যান্য সবাই সন্ধান চালালেন, কোন পথে বনহুর সরে পড়েছে।

যখন সবাই সন্ধান চালিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন তখন একজন প্রহরী হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো–স্যার, এই যে দেয়ালে রেখার মত কিছু নজরে পড়ছে

সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলেন মিঃ শংকর রাও এবং আরও অনেকে। তারা বিস্ময়ভরা নজরে দেখলেন কারাকক্ষের দেয়ালে একটা রেখার মত ফাটল রয়েছে।

মিঃ হারুন বললেন—-হাঁ, এই পথেই দস্যু বনহুর উধাও হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঐ স্থানে যে রেখার মত নজরে পড়ছে ওটা কোনো কঠিন বস্তু দ্বারা কেটে করা হয়েছে।

মিঃ শংকর রাও বললেন–কি ভয়ংকর ব্যাপার, কঠিন পাথর কেটে

মিঃ শংকর রাওয়ের কথা শেষ হয় না, একজন পুলিশপ্রধান যেমনি ধাক্কা দিয়েছেন অমনি পাথরটা ধসে পড়লো একপাশে।

সেকি ভীষণ এক সুড়ঙ্গপথ।

সবাই আশ্চর্য এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। এমন ঘটনা তাদের জীবনে এই প্রথম ঘটলো। হাঙ্গেরী কারাগারের দেয়াল কঠিন পাথর দিয়ে তৈরি ছিলো। সেই পাথর কি ভাবে কাটা হলো ভেবে পেলেন না কেউ।

মিঃ শংকর রাও বললেন–মুহূর্ত বিলম্ব না করে চলুন আমরা ঐ পথে ভিতরে প্রবেশ করি।

হাঁ, তাই করতে হবে। বললেন হাঙ্গেরী কারাগার রক্ষণাবেক্ষণকারী।

কয়েকজন শসস্ত্র পুলিশ নিয়ে মিঃ শংকর রাও এবং আরও দুজন পুলিশপ্রধান এবং মিঃ হারুন স্বয়ং প্রবেশ করলেন।

মিঃ শংকর রাও বললেন দস্যু বনহুর পালিয়ে বেশি দূর যেতে পারেনি।

মিঃ হারুন বললেন–বেশি দূরে সে গেছে কিনা এ নিয়ে আমাদের ভাবার কিছুই নেই। তবে সুড়ঙ্গপথ যে তার গন্তব্যস্থানে গিয়ে পৌঁছবে তা ঠিক।

কিন্তু বেশিক্ষণ তারা এ নিয়ে ভাববার সময় পেলেন না। কয়েকজন প্রবেশ করলেন এবং অস্ত্র বাগিয়ে ধরে এগুতে লাগলেন। প্রায় সবার হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র এবং বাম হাতে টর্চ লাইট। সুড়ঙ্গপথটি সম্পূর্ন নতুন খনন করা হয়েছে। এবড়ো থেবড়োভাবে অতি দ্রুত খনন করা হয়েছে। এবং সেই পথেই বনহুর হাঙ্গেরী কারাগার থেকে ভূগর্ভপথ দিয়ে নিখোঁজ হয়েছে।

টর্চের আলো ফেলে এগুচ্ছেন মিঃ শংকর রাও এবং তার দলবল।

অস্ত্র বাগিয়ে নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে এগুচ্ছে প্রহরিগণ।

এক অদ্ভুত সুড়ঙ্গপথ।

এমন সুড়ঙ্গপথ তারা দেখেননি কোনোদিন।

কি ভাবে এই সুড়ঙ্গপথ তৈরি করলো এবং কতদিনে তৈরি হলো কেউ তা নির্ণয় করতে পারলেন না।

সুড়ঙ্গপথ অন্ধকারময়।

টর্চের আলো পড়ে সুড়ঙ্গপথটাকে বিভীষিকাময় মনে হচ্ছে। উপরে চাপ চাপ মাটি আর পাথর ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে মাথার উপরের পাথরখন্ড খসে পড়তে পারে।

কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই কারও।

সবাই বনহুরের সন্ধানে উন্মাদ।

হাঙ্গেরী কারাগার থেকে বন্দী পালানো কম কথা নয়, তাও স্বয়ং দস্যু বনহুর।

সমস্ত শহরে কথাটা ছড়িয়ে পড়লো। দস্যু বনহুরকে বন্দী করে রাখা কারও সাধ্য নেই এটা প্রমাণ হলো পুনরায়।

হাসি ফুটলো অনেকের মুখে।

আবার আতঙ্কে ভীত হলো অনেকে।

বললো কেউ কেউ, বনহুরকে আটক করে এমন কেউ এ পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ।

সারা শহরে যখন দস্যু বনহুরকে নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা চলেছে তখন হাঙ্গেরী কারাগারের ভূগর্ভ সুড়ঙ্গপথে সন্ধান করে ফিরছেন প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তাগণ।

তারা যতই সুড়ঙ্গপথে এগুচ্ছে ততই হতবাক বিস্মিত হচ্ছেন।

সুড়ঙ্গপথটার যেন শেষ নেই।

পদব্রজে যতদূর দ্রুত এগুনো যায় এগুচ্ছেন মিঃ শংকর রাও দলবলসহ কিন্তু সুড়ঙ্গ গহ্বরের যেন শেষ নেই।

এতটা পথ কি করে খনন করা হলো?

এ প্রশ্ন সবাইকে ভাবিয়ে তুললো।

কিন্তু ভাবার সময় নেই এখন কারও। পুলিশ প্রধান এবং গোয়েন্দা প্রধান যখন অগ্রসর হচ্ছেন তখন তাদের বুকটা নিজেদের অজান্তে ধক ধক করছিলো, কারণ এমন ভয়ঙ্কর সুড়ঙ্গপথ তারা কখনও দেখেননি।

তবে সকলের মনে বিরাট একটা আশা, তারা এবার বনহুরের আস্তানা আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু সব আশা তাদের বিফল হলো, সুড়ঙ্গপথ হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে গেছে।

এবার পুলিশ প্রধান মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। সুড়ঙ্গপথটি এমন ভাবে রোধ হয়ে গেছে তাতে কোনো মতে এক পা অগ্রসর হবার মত উপায় নেই।

সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগলেন চারদিক। বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন তারা। গেলো কোথায় বনহুর এবং কি করে উধাও হলো?

পুনরায় ফিরে যাবার জন্য যেমনি তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, অমনি একটা দেয়াল তাদের পথরোধ করে দিলো।

সবাই হতভম্ব হয়ে পড়লেন।

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে সকলের।

কেমন যেন ঝিমঝিম করতে লাগলো মিঃ হারুনের মাথাটা। শুধু মিঃ হারুনই নন, যারা সুড়ঙ্গপথে অগ্রসর হচ্ছিলেন সবাই মাতালের মত টলতে লাগলেন।

তারপর কে কোন্ সময় গড়িয়ে পড়লেন তা কারও খেয়াল রইলো না।

*

যখন সংজ্ঞা ফিরে আসলো তখন মিঃ শংকর রাও ও মিঃ হারুন এবং তার অন্যান্য সঙ্গী একেবারে স্তব্ধ হয়ে পড়লেন। তারা এখন কোথায়? কেমন করেই বা এখানে এলেন? কিন্তু কে দেবে তার জবাব।

মিঃ শংকর রাও এবং তার সঙ্গীরা সবাই আধো অন্ধকারে এ ওর দেহ হাতড়ে অনুভব করলেন, তারা সকলেই রয়েছেন এখানে বেশ বুঝতে পারলেন।

ডাকলেন মিঃ হারুন–মিঃ শংকর রাও।

বলুন।

একি হলো?

তাই তো দেখছি।

এখন আমরা কোথায়?

জানি না।

মনে হচ্ছে বনহুরের কোনো ভূগর্ত বন্দীশালায়?

হাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

তাহলে উপায়?

উপায় এখন তিল তিল করে মৃত্যুবরণ করা।

কিন্তু এত সহজে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া যায় না।

তাছাড়া উপায় কি বলুন?

মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাওয়ের মধ্যে অন্ধকার বন্দিগুহায় কথাবার্তা হচ্ছিলো।

এমন সময় একজন পুলিশ অফিসার বলে উঠলেন–স্যার, এতগুলো লোককে বনহুর একসঙ্গে বন্দী করে আনলো কি করে এটা ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি।

আমিও এ ব্যাপারে বিশেষভাবে আশ্চর্য হয়েছি। বললেন মিঃ হারুন।

শংকর রাও বললেন– সুড়ঙ্গপথটা সম্পূর্ন রুদ্ধ ছিলো, এতটুকু পথ ছিলো না যে পথে কেউ বেরিয়ে যেতে পারে শুধু হাঙ্গেরী কারাগারের সেলের ভিতর ছাড়া।

সব বিস্ময়কর।

হাঁ, বিস্ময়করই বটে।

বনহুরকে বন্দী করে রাখার সাধ্য কারও নেই জানতাম, তাই বলে…

হঠাৎ একটা অট্টহাসির শব্দ।

সবাই চমকে উঠলো।

আবছা অন্ধকারে অস্পষ্ট পরিলক্ষিত হলো এক জমকালো মূর্তি।

মিঃ শংকর রাও এবং মিঃ হারুন ও তাদের সঙ্গিগণ একেবারে হতভম্ব হলেন। কি করে এই অন্ধকার বন্দীগুহায় এই জমকালো মূর্তি প্রবেশ করলো। একেবারে আশ্চর্যভাবে।

কোনো দরজা বা পথ নজরে পড়ছে না এবং কোনো দরজা খোলার শব্দও কানে আসেনি। মনে হচ্ছে যেন অন্ধকারে জমকালো মূর্তি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ছিলো, হঠাৎ সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও এবং সঙ্গিগণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন জমকালো মূর্তিটার দিকে।

একি, মেঝেটা নড়ে উঠলো যে!

সাঁ সাঁ করে নামছে মেঝেটা।

পুলিশপ্রধান মিঃ হারুন বললেন–কে তুমি? তুমিই কি দস্যু বনহুর

অট্টহাসি থেমে গেলো।

মেঝেটা নামছে।

জমকালো মূর্তি বললো–হাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি।

বনহুর।

হাঁ।

কি করে তুমি হাঙ্গেরী কারাকক্ষ থেকে পালালে? বললেন মিঃ হারুন।

বনহুর বললো,–সব বলবো।

বলবে

হ বলবো।

ততক্ষণে মেঝেটা থেমে গেছে। একেবারে নিশ্চল নিশ্চুপ স্থির হয়ে পড়েছে মেঝেটা।

মিঃ হারুন, মিঃ শংকর রাও ও তাদের দলবল যারা বন্দী অবস্থায় সেই আবছা অন্ধকার গুহায় ছিলেন তারা দেখলেন অন্ধকার গুহাটা আলোময় হয়ে উঠেছে।

এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জমকালো মূর্তি এক অদ্ভুত পুরুষ, মাথায় পাগড়ি–পাগড়ির আঁচলে মুখের নিচের অংশ ঢাকা। শুধু দীপ্ত উজ্জ্বল নীল চোখ দুটো আলোতে জ্বলছে। প্রশস্ত ললাট, এলোমেলো চুলে ঢাকা, বড় সুন্দর লাগছে।

আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন পুলিশমহলের লোকজন। কারণ বহুক্ষণ অন্ধকারে থাকার জন্য চোখে কেমন ধা ধা লেগে গিয়েছিলো।

চোখ রগড়ালেন কেউ কেউ।

এবার বললেন মিঃ হারুন–বলো বনহুর, কি করে তুমি হাঙ্গেরী কারাগার থেকে সুড়ঙ্গপথ। তৈরি করলে?

জানি এই প্রশ্নই আপনারা করবেন। কিন্তু আপনাদের বোঝা দরকার সঠিক জবাব আপনারা আমার কাছে পাবেন না, কারণ আপনাদের আমি হত্যা করবে না। যদি আপনাদেরকে হত্যা করতাম তাহলে আজ সমস্ত কথা অকপটে ব্যক্ত করতাম। কাজেই....।

বনহুর, তুমি আমাদের মুক্তি দেবে? বললেন মিঃ জামশেদ আলী। তিনি হাঙ্গেরী কারাগার রক্ষণাবেক্ষণকারী। তিনি ভীষণ ভড়কে গেছেন। দস্যু বনহুরের কবল থেকে রক্ষা পাবেন এ যেন তার ধারণার বাইরে। বনহুর যখন বললো আপনাদের আমি হত্যা করবো না, তখনই একটা খুশির উৎস বয়ে গেলো মিঃ জামশেদ আলীর মনে। শুধু জামশেদ আলী নয়, সবার মনেই কিছুটা সান্ত্বনা এলো। অবশ্য মিঃ শংকর রাও জানেন দস্যু বনহুর যত দুর্ধর্ষই হোক না কেন, সে সহজে কাউকে হত্যা করে না। তাই তিনি বেশ সহজ স্বাভাবিক ছিলেন এতটুকু মুষড়ে পড়েন নি। বরং তার মনে একটা বিপুল রহস্যপূর্ন ভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো, যা তিনি অতি কষ্টে দমন করে রেখে সবকিছু লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন এবং ভাবছিলেন বনহুরের আস্তানার সন্ধান তারা পাবেন।

দস্যু বনহুর যখন তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো তখন মিঃ হারুন, মিঃ শংকর রাও এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার নিশ্চুপ শুনছিলেন।

মিঃ জামশেদ আলীই পুনরায় বললেন–তুমি কি আমাদের মুক্তি দেবে?

এবার বললো বনহুর–মুক্তি দিতে পারি তবে এক শর্তে! যদি সেই শর্তে আপনারা রাজি হন তাহলে আমি মুক্তি দেব, নচেৎ আমি আজীবন আপনাদের এই অন্ধগুহায় আটক করে রাখবো। হত্যা আমি করবো না, কারণ হত্যা করার মত অপরাধ এখনও আপনারা করেন নি।

বললেন মিঃ হারুন–বলো তোমার কি শর্ত? তার পূর্বে আরও একটা জবাব তোমাকে দিতে হবে।

বলুন মিঃ হারুন?

তুমি দেখছি আমার নামও জানো?

জানি এবং আপনাদের সবার নাম আমার লিস্টে আছে। তা ছাড়া দীর্ঘ সময় ধরে আপনি আমাকে সন্ধান করে ফিরছেন আর আমি আপনার নাম জানবো

না?

তাহলে তুমি সবকিছুই জানো।

হাঁ জানি এবং জানি বলেই তো আপনাদের এত সহজে আটক করতে পেরেছি। শুনুন মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও, আপনারা ভেবেছিলেন আমাকে হাঙ্গেরী কারাগারে আটক রেখে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করবেন। ভেবেছিলেন চিরতরে আমাকে মুছে ফেলবেন এ পৃথিবী থেকে কিন্তু সব প্রচেষ্টা আপনাদের ব্যর্থ হয়েছে। আবার বনহুর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো, তারপর হাসি থামিয়ে বললো–শুধু এবার নয়, আরও কয়েকবার আপনারা আমাকে আটক করবার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন এবং কিছুটা সার্থকও হয়েছিলেন তবে উদ্দেশ্য আপনাদের সফল হয়নি। তবুও আপনারা ক্ষান্ত হননি, বারবার আমাকে জ্বালাতন করেছেন এবং করছেন। জেনে রাখুন, আপনারা কোনোদিনই সফল হতে পারবেন না। এমন কোনো শক্তি নেই যে শক্তি আমাকে আটক করে রাখতে পারে। একটু থেমে বললো বনহুর– আপনারা যে সুড়ঙ্গপথ হাঙ্গেরী কারাগারের তলদেশে দেখতে পেয়েছেন ওটা আমার আস্তানার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। ওটার শেষ পথ হলো হাঙ্গেরী কারাগার হতে প্রায় বিশ মাইল দূরে রুমানিয়া গ্রামের কোনো এক কৃষকের উঠানের ইঁদারার মধ্যে।

বনহুরের কথাগুলো শুনছিলেন মিঃ হারুন ও মিঃ শংকর রাও এবং তাদের সঙ্গীরা। তারা শুধু শুনেই যাচ্ছিলেন কেউ কোনো উক্তি উচ্চারণ করছিলেন না, তবে আবাক হয়ে দেখছিলেন বনহুরের চোখ দুটো। উজ্জ্বল আলোতে বনহুরের চোখ দুটো যেন জ্বলছিলো।

বনহুর বলছিলো–ঐ ইঁদারার মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ চলে গেছে হাঙ্গেরী কারাগারের তলদেশ দিয়ে হাঙ্গেরী কারাগারের সেলের মধ্যে।

তাহলে আমরা যে সুড়ঙ্গমধ্যে কোনো পথ খুঁজে পেলাম না এর কারণটাও নিশ্চয়ই বলবে? বললেন মিঃ হারুন।

হা বললো। কারণ আরও একটা পথ ছিলো বা আছে যে পথে আপনাদের সরানো হয়েছে। যাক ওসব কথা, আমি আর বেশি কথা বলতে রাজি নই বা চাই না। এখন আমার শর্তটি শুনুন। একটি সুই টিপলো বনহুর, সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখে হাজির হলো একটা মেশিন, অদ্ভুত মেশিন ঠিক কতকটা সাউন্ড মেশিনের মত।

বললো বনহুর–মিঃ শংকর রাও এবং মিঃ হারুন, আপনারা ইচ্ছামত মুক্তি পাবেন যদি এই মেশিনের সাউন্ড বক্সের মুখে কিছু বক্তব্য রাখেন বা বলেন, কথাগুলো আপনারা পুলিশমহলকে জানিয়ে দেবেন অবশ্য যে কথাগুলো আপনারা এখন এই মেশিনের সামনে বলবেন তা কোনোক্রমে অসত্য বলে প্রকাশ করবেন না। তাহলে আপনাদের সবার নাম আমার লিস্টে আছে, এ কথা আমি পূর্বেও বলেছি। যদি মিথ্যা বলে প্রকাশ পায় কেউ রেহাই পাবেন না আমার কবল থেকে এবং পুনরায় এই স্থানে আপনাদের ফিরিয়ে আনা হবে। তারপর যা ঘটবে সে কথা এ মুহূর্তে আমি বলতে চাই না। পুলিশমহলে ওয়্যারলেসের সঙ্গে এ মেশিনের যোগাযোগ আছে, কাজেই যা বলবেন তা পুলিশমহল জানতে পারবে এবং তা প্রচার পাবে আপনারা পুলিশ অফিসে ফিরে যাবার পূর্বেই। আমার উদ্দেশ্য, নূর যেন বুঝতে পারে দস্যু বনহুর মৃত্যুবরণ করেছে। এবার আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন।

বললেন মিঃ হারুন–হ, বুঝতে পেরেছি। তুমি তোমার সন্তানের কাছে মৃত বলে নিজেকে প্রমাণ করতে চাও?

ঠিক তাই মনে করুন।

পুলিশপ্রধান এবং মিঃ শংকর রাও একবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলেন।

অন্যান্য যারা ছিলেন তারাও একবার এ-ওর দিকে তাকালেন।

বনহুর বললো–কোনো পিতাই চায় না তার সন্তান পিতাকে ভুল বুঝুক।

যা সত্য তা তুমি গোপন করতে চাও?

না।

তবে?

এক সময় গোপন করতে চেয়েছিলাম কিন্তু সব সময় সত্য গোপন থাকে না। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলো বনহুর।

কিছুক্ষণের জন্য ভূগর্ভ কক্ষটা নিস্তব্ধতায় ভরে গেলো। বনহুরের চাপা নিঃশ্বাসটা যেন কক্ষটার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে অশরীরী আত্মার মত।

একটু থেমেই বনহুর বলতে শুরু করলো– বনহুরকে আপনারা হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন শুধু এটুকুই বলবেন।

তাহলে তুমি আমাকে মুক্তি দেবে?

হ দেবো।

এতে তোমার লাভ

লাভ হবে এবং আমি সান্ত্বনা পাবো।

তুমি আর লোকসমাজে নিজেকে প্রকাশ করত পারবে না বা চাওনা?

না।

তুমি পারবে তোমার দস্যুতা থেকে চিরতরে বিদায় নিতে।

দস্যুতা আমার পেশা নয়, আমার নেশা, কাজেই নেশাকে পরিহার করা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না বিশেষ স্বার্থের খাতিরে আমাকে এটা মেনে নিতে হবে এবং আমার সন্তানের জন্যই আমি তা করবে। আপনারা আমার শত্রু নন, আপনাদেরকে আমি মিত্র বা বন্ধু বলেই জানি যা আপনারা করেন তা আপনাদের কর্তব্যের খাতিরে করেন।

বনহুর, তোমার মুখে এসব কথা সাজে না বুঝলে? যে পুলিশ মহলকে তুমি প্রতি মুহূর্তে নাকানি চুবানি খাওয়াচ্ছো তাদের তুমি বন্ধু বা মিত্র বলে স্বীকার করলেও তা কতদূর সত্য তা জানি না।

আমি তো বলেছি শুধু আমার সন্তানের জন্যই সব আমি করবো বা করতে পারি।

বনহুর আর মিঃ হারুনের কথাবার্তা হচ্ছিলো।

অন্যান্য সবার চোখে বিস্ময়, তারা বনহুরের কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনে যাচ্ছিলেন। অনেকেই জানেন না প্রখ্যাত ডিটেকটিভ মিঃ নুরুজ্জামান চৌধুরী স্বয়ং দস্যু বনহুরের সন্তান।

সবার মনে বিস্ময় কিন্তু কারও মুখে কোনো কথা নেই। তারা বনহুকে এমন স্পষ্টভাবে দেখেননি। আজ যেমন একেবারে স্পষ্টভাবে দেখছেন। তারা শুধু বনহুরের নামের সঙ্গে এবং তার কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত আছে।

উজ্জ্বল আলোতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলো সবাই বনহুরকে।

জমকালো পোশাকে বনহুরকে আশ্চর্য মনে হচ্ছিলো।

মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও ছাড়া কেউ বনহুরকে ভালোভাবে দেখেননি কোনোদিন। আজ পুলিশ প্রধান এবং পুলিশ অফিসার কয়েকজন তাকে অবাক চোখে দেখছেন। শুধু দেখেই তারা বিস্মিত হচ্ছেন না, তার কণ্ঠস্বর তাদের কানে অদ্ভুদ এক রেশ সৃষ্টি করে চলেছে।

মিঃ হারুন বললেন– তোমার এই আশ্চর্যজনক মেশিনটা কি এবং এর সম্মুখে কথা বললে তার ফলাফল কি হবে?

হাঁ, এই মেশিনটা বিস্ময়কর বটে। আপনারা যে কথাগুলো এই মেশিনের সাউন্ডবক্সের সম্মুখে উচ্চারণ করবেন তা সরাসরি পুলিশমহলের জরুরি ওয়্যারলেসে ধরা পড়বে। নিন, বিলম্ব না করে আমি যা বললাম সেইভাবে বলুন। মিঃ হারুনকে আমি বলবার জন্য অনুরোধ করছি।

তাহলে তুমি আমাদের মুক্তি দেবে? বললেন মিঃ শংকর রাও।

. কথাটা অবশ্য অত্যন্ত করুন ছিলো না, তবু বললো বনহুর–শুধু মুক্তিই দেবো না, পৌঁছে দেবো স্ব স্ব স্থানে।

মিঃ হারুন বনহুরের কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, কারণ সে স্বাভাবিক মানুষ নয়–একজন দস্যু।

বনহুর মিঃ হারুনকে নীরব থাকতে দেখে হেসে বললো–অবিশ্বাসের কিছু নেই, আমি অসত্য কথাকে ঘৃণা করি। তাছাড়া আপনারা আমাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন এবং মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেছিলেন, তার কারণ আমি আপনাদের চোখে অপরাধী...

হাঁ, তুমি অধী এবং সে কারনেই তোমাকে আমরা ক্ষমা করতে পারি না।

কিন্তু আসল অপরাধী যারা তারা আপনাদের দৃষ্টিতে মহৎজন, আমি অপরাধী....কথা শেষ করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল বনহুর।

অবাক চোখে তাকিয়ে রয়েছেন তারা।

একি বিস্ময়!

এমন করে হাসতে পারে বনহুর।

তারা কোনোদিন এমন হাসি শোনেনি।

এ যেন এক নতুন রাজ্য।

যা তারা ভাবতে পারেননি কোনোদিন।

তারা বহুবার বহু রহস্যজালে জড়িয়ে পড়েছেন পুলিশ বিভাগে কাজ করতে গিয়ে কিন্তু আজ যে রহস্যজালে জড়িয়ে এক বিস্ময়কর রাজ্যে উপনীত হয়েছেন তা যেন কল্পনার চেয়েও সত্য। এমন সুড়ঙ্গ খনন তারা কোনোদিন দেখেছিলেন কি? মোটেই দেখননি। এমন ভয়ংকর এক অন্ধগুহা, কোনোদিন দেখেছিলেন কি? তাও তারা দেখেননি? হঠাৎ অকস্মাৎ জমকালো মূর্তির আবির্ভাব দীপ্ত উজ্জ্বল আলো...অদ্ভুত কণ্ঠস্বর, বিস্ময়কর মেশিন, আশ্চর্যজনক অট্টহাসি ....

কি ভাবছেন?

হুশ হলো যেন বনহুরের কথায়।

বললেন মিঃ হারুন—-বলো কি বলবো?

যা বললাম।

আচ্ছা রাজি। পুনরায় তোমার বক্তব্যগুলো আমাদের বলো। বললেন মিঃ হারুন।

হাঁ সেজন্য আমি প্রস্তুত আছি। বনহুর আরও একটু সরে দাঁড়ালো মেশিনটার দিকে। এবার সে বললো যা সে পূর্বে বলেছিলো।

মিঃ হারুনকে মেশিনের দিকে এগিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিলো বনহুর।

মিঃ হারুন এগিয়ে এলেন মেশিনটার দিকে।

বনহুর মেশিনের গায়ে একটা সুইচ টিপলো।

আলো জ্বলে উঠলো।

আলোর বাটি মেশিনের গায়ে বসানো ছিলো। যেন দুটি চোখ।

লাল টকটক আলো।

কেমন যেন জ্বলছে আর নিভছে।

একটা শব্দ হচ্ছে কো–কো করে।

মিঃ হারুন বনহুরের শিখিয়ে দেওয়া কথাগুলো বলতে শুরু করলেন।

.....্যালো পুলিশ অফিস ....আমরা কৃতকার্য হয়েছি। দস্যু বনহুরকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি...আমরা এখন ভূগর্ভ গুহায়। তবে আশা রাখি আমরা ফিরে আসতে সক্ষম হবো.....

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের শব্দ হলো, পরক্ষণেই ভেসে এলো পুলিশ প্রধান মিঃ আহমদের কণ্ঠস্বর। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, আপনি কে বলছেন? দস্যু বনহুরকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন...কে আপনি বা কারা আপনারা?...

মিঃ হারুন নিজ পরিচয় দিলেন, বললেন–আমি পুলিশ সুপার হারুন বলছি, আমরা সবাই এখন কোনো এক গোপন ভূগর্ভ আস্তানায় রয়েছি তবে কার্যসিদ্ধ হয়েছে....

ভেসে এলো ওয়্যারলেস সাউন্ড বক্সে মিঃ আহমদের গলা....আমরা আনন্দ উপভোগ করছি এবং তার সঙ্গে করছি বিস্ময় প্রকাশ। যাক এতদিনে তাহলে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। দস্যু বনহুরের মৃতদেহ নিয়ে আসবেন বলে আমরা আশা করছি।

ঠিক তখন বনহুরের অদ্ভুত মেশিনে কথাগুলো টেপ হয়ে গেলো এবং ওদিক থেকে যে কথাগুলো ভেসে এলো তাও রেকর্ড হলো।

বনহুর সুইচ টিপে অফ করে দিলো।

তারপর বললো–যা আপনারা আমাকে বাঁচালেন।

একটা সুইচে চাপ দিতেই মেশিনটা প্রবেশ করলো মেঝের অভ্যন্তরে।

বনহুর বললো–আপনারা নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত। কারণ বহু সময় আপনাদের পথ চলতে হয়েছে। এবার পথ চলা শেষ, কারন আপনারা নিজ নিজ বাসভূমিতে ফিরে যেতে পারবেন তবে কোনো রকমেই যদি এ কথা প্রকাশ পায় যে, আপনারা দস্যু বনহুরকে হত্যা করতে সক্ষম হননি তাহলে আবার আপনারা ফেরত আসবেন এখানে এই ভূগর্ভ গুহায়।

কিন্তু....

বলুন মিঃ হারুন আপনি কি বলতে চান?

আমরা নীরব থাকতে পারি এ ব্যাপারে যদি তোমার পুনরায় আবির্ভাব না ঘটে।

হাঁ, আমি সম্পূর্নভাবে মুছে যেতে চাই...বিশেষ করে আমার সন্তানের কাছে এবং সন্তানের কাছে মুছে যেতে হলে আমার অন্তর্ধান দরকার। আমি যা বলবো তার কোনো ব্যতিক্রম হবে না।

একটা তক্তাযুক্ত স্থানে বনহুর তার ভারীবুটসহ পা রাখলো, সঙ্গে সঙ্গে একটা টেবিল বেরিয়ে এলো দেয়ালের মধ্য হতে।

সবাই অবাক হয়ে দেখলো টেবিলে নানা ধরনের খাদ্যসম্ভার।

এমন স্থানে এমন বিস্ময়কর পরিবেশে এমন মূল্যবান খাদ্যসম্ভার সত্যি আশ্চর্য বটে।

বললো বনহুর–আপনারা ক্ষুধার্ত, কাজেই যার যা ইচ্ছা হয় খেতে পারেন।

মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও উভয়ে উভয়ের মুখে তাকিয়ে কিছু ইংগিত করলেন।

অন্যান্য যারা ছিলেন তারাও ভীষণ ক্ষুধার্ত।

কাজেই তারা মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাওয়ের দিকে তাকালো।

বনহুর বুঝতে পারলো মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও সন্দেহ করছেন খাবারে কোনো বিষাক্ত পদার্থ মেশানো হয়েছে কিনা। তাই বনহুর খাবার তুলে নিয়ে খেতে শুরু করলো। বিনা দ্বিধায় এবার মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও দলবলসহ খেতে আরম্ভ করলেন।

বনহুরের সম্পূর্ন মুখমন্ডল এবার তার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, কারণ পাগড়ির আঁচল বনহুর সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলো খাবার গ্রহণের পূর্বে।

পুলিশ অফিসারগণ বিস্ময়ভরা চোখে বনহুরকে দেখছিলেন, কারণ তাঁরা বনহুরকে বন্দী করতে এলেও এমন স্পষ্টভাবে দেখেননি কোনোদিন। ভুলে গেলেন তাঁরা খাবারের কথা।

বনহুর বললো–আপনাদের বেশ অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে, খেয়ে নিন।

লজ্জিত হলেন পুলিশ মহলের কর্মকর্তাগণ। তারা পুনরায় খেতে শুরু করলেন।

মিঃ হারুন চোখ মেলে তাকালেন, পাশে কেউ শুয়ে আছে তার কক্ষে ডিমলাইটা জ্বলছে।

তাকালেন তিনি ডিমলাইটের স্বল্প আলোতে পাশে শায়িত ব্যক্তির দিকে।

ভালভাবে লক্ষ্য করতেই তিনি দেখলেন পাশে শায়িত ব্যক্তি অন্য কেউ নন মিঃ শঙ্কর রাও। একি, এটা কোন যায়গা? তিনি তাকালেন কক্ষটার চারদিকে। একটু ভালভাবে তাকিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন এটা কান্দাই শহরের তাঁদেরই সার্কিট হাউস।

একটু নজর ফেলতেই আরও অবাক হলেন মিঃ হারুন, তাদের সঙ্গীগণ সবাই নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে।

এরা কি করে এখানে এলো?

কিন্তু কে দেবে তার জবাব।

মনে পড়লো সেই ভূগর্ভ সুড়ঙ্গের কথা, সেই বিস্ময়কর মেশিন, সেই দ্বীপ্ত উজ্জ্বল আলো। জমকালো পোশাকে সজ্জিত স্বয়ং দস্যু বনহুর। খাবারের টেবিলটার কথা স্মরণ হতেই মিঃ হারুনের সব মনে পড়লো। তাহলে বনহুর যা বলেছিলো তাই করেছে। সে তাদের সবাইকে শহরের সার্কিট হাউসে পৌঁছে দিয়ে গেছে...

মিঃ হারুন বিছানায় উঠে বসলে তখনও রাত ভোর হয় না। পাশের শার্শী দিয়ে তাকিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন বাইরে জমাট অন্ধকার।

একটু শব্দ করে ডাকলেন তিনি– কেউ আছো? কেউ আছো আশেপাশে।

একজন লোক এগিয়ে এলো ব্যস্তভাবে এসে অবাক চোখে তাকালো মিঃ হারুনের দিকে।

বললেন মিঃ হারুন—-কি দেখছো অমন করে?

লোকটা বললো স্যার, আপনাদের জ্ঞান ফিরে এসেছে তাহলে? যাই খবর দিয়ে আসি। বলেই চলে যাচ্ছিলো লোকটা।

লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে এগিয়ে এলো। সে অবাক চোখে এবং আনন্দভরা কণ্ঠে বললো–আপনার জ্ঞান ফিরে এসেছে স্যার? যাই বড় সাহেবকে বলে আসি। চলে যাবার জন্য পুনরায় পা বাড়াইতেই বললেন মিঃ হারুন–শোনো।

বলুন স্যার?

তুমি কে?

আমি এই ডাকবাংলোর পাহারাদার।

তোমার নাম কি?

মংলু।

আমরা এখানে কি করে এলাম বলতে পারো?

হাঁ পারি।

বলো তো কি করে আমরা এই ডাকবাংলোয় বা সার্কিট হাউসে এলাম।

স্যার। এটা সার্কিট হাউস নয়, এটা পুলিশ অফিস ডাকবাংলো।

হাঁ, আমি চিনতে পেরেছি। কিন্তু এখানে এলাম কি করে?

কেন স্যার, আপনারা কিছু জানেন না?

না। তুমি বলো দেখি।

স্যার, আশ্চর্যজনক ঘটনা।

কেমন?

বলছি স্যার, তার পূর্বে বড় সাহেবকে কথাটা বলে আসি। তিনি পাশের কক্ষে রয়েছেন।

তুমিই বলো, তারপর বড় সাহেবকে সংবাদ দিও। তা ছাড়া এখনও সবাই সংজ্ঞা ফিরে পাননি, কাজেই তুমি বলো কি করে এখানে আমরা এলাম?

বলছি স্যার। রাত তখন একটা হবে, এমন সময় একটা অদ্ভুদ ধরনের গাড়ি এসে ডাকবাংলোর গেটে থামলো। গাড়িখানা সম্পূর্ন কালো রঙের। আমি, শুধু আমি ছিলাম। গাড়ির শব্দ শুনে চোখ রগড়াতে রগড়াতে এগিয়ে গেলাম, তখন গাড়ি ফটকের ভিতরে প্রবেশ করেছে।

একেবারে বাংলোর সামনে এসে দাঁড়ালো গাড়িখানা, তারপর গাড়ির দরজা খুলে দুতিন জন লোক নেমে এলো, তাদের শরীরে পুলিশের পোশাক ছিলো। লোক তিনজনকে পুলিশ মনে করে আমি নীরব রইলাম।

তারপর?

তারপর তারা যে পুলিশের লোক নয়, এটা বুঝলাম পরে। শুনুন স্যার, পুলিশের ড্রেসপরা তিনজন দ্রুত আপনাদের কয়েকজনকে ধরাধরি করে ডাকবাংলোর কক্ষে এনে শুইয়ে দিলো। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করায় পুলিশের ড্রেসপরা একজন বলে উঠলো–আমাদের মহামান্য পুলিশ প্রধান মিঃ হারুন এবং তার দল দস্যু বনহুরকে হত্যা করে ফিরে আসছিলেন হঠাৎ পথিমধ্যে তারা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কি হয়েছে বা হয়েছিলো কিছু তারা আমাকে বলে না। আমি নিজেও বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস পাইনি, কারণ আমি একজন পাহারাদার মাত্র। এত কথা আমার জানার নয়–ওরা এত যত আপনাদের সংজ্ঞাহীন দেহগুলোকে গাড়ি থেকে নামিয়ে বাংলোর বিছানায় শুইয়ে দিলো, তা সত্যিই আশ্চর্য স্যার। আমি কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। বরং ওদের সাহায্য করে চললাম। অবশ্য আমি আপনাদের চিনি বলেই তাদেরকে সাহায্য করেছি।

তারপর?

আপনাদের সবাইকে শুইয়ে দিয়ে ওরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

আর তুমি চুপ করে রইলে?

না স্যার, আমি এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে পুলিশ সুপারের নিকট টেলিফোন করলাম এবং সংক্ষেপে বললাম ঘটনাটা

হাঁ, এবার সব বুঝতে পারলাম। বললেন মিঃ হারুন। তারপর বললেন–পুলিশ সুপার কি এসেছিলেন?

তিনি এবং অন্যান্য কয়েকজন পুলিশ অফিসার তখনই এসে হাজির হলেন আপনাদের সবাইকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। বড় সাহেব বললেন আপনারা এভাবে ফিরে আসবেন তিনি ভাবতে পারেননি। আপনারা দস্যু বনহুরকে নিহত করেছেন সে কথা আমরা সবাই শুনেছি কিন্তু

যাক সে সব কথা, তোমাদের বড় সাহেব কোথায়?

তিনি একটু পূর্বে পাশের ক্যাবিনে গেছেন।

তিনি কি ঘুমাচ্ছেন?

হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন তবে তিনি এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার এতক্ষণ এখানেই ছিলেন। কারণ সংবাদ পেয়েই সবাই এসে হাজির হয়েছিলেন। প্রায় দুঘন্টা তারা আপনাদের সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা চালিয়েছিলেন, তারপর যখন ডাক্তার বললেন ভয়ের কোনো কারণ নেই, সময় হলে জ্ঞান ফিরে আসবে তখন ওনারা বিদায় গ্রহণ করলেন, শুধু রইলেন আহমদ সাহেব এবং তার সহকারী। স্যার, ডাকবো তাদের?

যদি ঘুমিয়ে থাকেন তবে ডেকো না, আর যদি জেগে থাকেন তাহলে আমি তাকে ডাকছি... যাও দেখে এসো।

চলে গেল পাহারাদার।

মিঃ হারুন ভাবছেন অনেক কথা কেমন করে তারা এখানে এলেন? যদিও পাহারাদারের নিকট কিছুটা জানতে পারলেন বা পেরেছেন, তা একেবারে সবকিছু অনুধাবন করার মত নয়। বনহুরের কথা স্মরণ হলো, তার কথাগুলো মনে পড়ছে। সেই বদ্ধ ভূগর্ত কক্ষ, সেই দীপ্ত উজ্জ্বল আলো, অদ্ভুত মেশিন, বিস্ময়কর টেবিল, মূল্যবান খাদ্যসম্ভার সব কথা খেয়াল হচ্ছে। এমন কি খাবারের পূর্ব মুহূর্তের কথাগুলোও মনে পড়ছে ভালভাবে। কত সুস্বাদু খাবার তারা খেয়েছিলেন। কিন্তু তারপর আর কিছু স্মরণে আসছে না।

নিশ্চয়ই খাবারে কোনো রকম ওষুধ মেশানো ছিলো যা খাবার পর তাঁরা সবাই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

মিঃ হারুন নিজের পাশে শায়িত মিঃ শংকর রাও এবং অন্যান্য বিছানায় ও মেঝের কার্পেটে শায়িত সঙ্গীদের দিকে তাকালেন। সবাই নিশ্চিন্ত মনে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছেন।

যেন গো বেচারীর দল।

মিঃ হারুন নিজেও একজন নিরীহ ভাল মানুষ বনে গেছেন। দস্যু বনহুরের কাছে এভাবে পরাজয় বরণ করতে হবে ভাবতে পারেননি যেন তিনি। এ পরাজয়কে মিঃ হারুন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন, কারণ জীবন নিয়ে বাজি। এমন এক পর্যায়ে তারা উপনীত হয়েছেন যেখান থেকে তাদের ফেরার কোনো পথ নেই। তাই বাধ্য হয়ে মিঃ হারুন মেনে নিয়েছিলেন বনহুরের কথাগুলো।

হাঁ, এখন তারা বনহুরের নাগালের বাইরে চলে আসতে সক্ষম হয়েছেন বটে কিন্তু লক্ষের বাইরে নয়। যদি এখন সত্য প্রকাশ করেন তাহলে বনহুর প্রতিশোধ নিতে পিছপা হবে না এ কথা সত্য।

যেমন করে হোক সত্য গোপন রেখে মিথ্যাটাই বেছে নিতে হবে, কারণ তিনি নিজে ওয়্যারলেস মেশিনে জানিয়েছেন দস্যু বনহুরকে তারা হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন। এখন কিছুতেই বলা যায়না তারা সেদিন বনহুরের নির্দেশক্রমে মিথ্যা বলেছেন। আর যদিও বা বলেন তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। বনহুর তা স্পষ্ট বলে দিয়েছে সকলের সামনে। মন্দ নয় যদি সে সত্যই কান্দাই থেকে অন্তর্ধান হয় তাহলে কতকটা নিশ্চিন্ত হবেন কান্দায় সরকার।

যাক ওসব কথা। নিজের মনকে যেন ধমক দেন মিঃ হারুন। ভাবেন এখন কি তার কর্তব্য....সবাই যখন এসে তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করবেন তখন এক গাদা মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই কিছু।

মিঃ হারুন উঠে দাঁড়াতে যাবেন, এমন সময় তাঁর ক্যাবিনে প্রবেশ করলো পুলিশ প্রধান মিঃ আহমদ ও সহকারী। তাদের পেছনে রয়েছে বাংলোর দারোয়ান।

মিঃ হারুনকে উঠে দাঁড়াতে দেখে মিঃ আহমদ বলে উঠলেন—-আপনি উঠবেন না স্যার, শুয়ে থাকুন।

কথাটা বলতে বলতে মিঃ হারুনের পাশে এসে দাঁড়ালেন মিঃ আহমদ ও তার সহকারী।

সালাম জানালেন মিঃ হারুনকে তারা।

মিঃ হারুন বললেন–আসুন মিঃ আহমদ, বসুন।

মিঃ আহমদ এবং তার সহকারী মিঃ হারুনের শয্যার পাশে আসন টেনে নিয়ে বসলেন।

মিঃ আহমদ বললেন–স্যার, আপনাদের এমন অবস্থা হলো কি করে? সবাই আমরা বিস্মিত হয়েছি।

হাঁ, বিস্মিত হবার কারণ বটে। আমরা ঠিকভাবেই কাজ সমাধা করে ফিরে আসছিলাম। কিন্তু পথিমধ্যে বিশ্রামকালে কেমন করে কি ঘটে গেলো তারপর আর কিছু স্মরণ নেই।

স্যার, কিভাবে দস্যু বনহুরকে হত্যা করলেন এটা জানবার জন্য উদগ্রীব রয়েছি। বললেন মিঃ আহমদ। একটা জানার গভীর বাসনা মিঃ আহমদ এবং তার সহকারীর মনে উঁকি দিলেও তারা সংযত রইলেন।

পরদিন।

সবাই এসে হাজির হলেন ডাকবাংলোয়।

ঘিরে ধরলেন মিঃ হারুন, মিঃ শংকর রাও এবং অন্যান্য পুলিশকে।

সকাল হতেই সংজ্ঞা ফিরে এসেছিলো সকলের।

শুধু একজন পুলিশ তখনও সংজ্ঞা ফিরে পায়নি। তাকে ওপাশের একটা খাটে শুইয়ে রাখা হয়েছে।

মিঃ আহমদ ডায়েরী হাতে নোট করছিলেন।

সাংবাদিকগণ তারাও ঘিরে ধরেছেন। বিস্ময়কর সংবাদ সহ তাদের কাজ।

সবার চোখেমুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে।

দস্যু বনহুরকে হত্যা করেছেন মিঃ হারুন ও মিঃ শংকর রাও এবং তাদের দলবল। এ কম কথা নয়, এ যেন এক বিস্ময়। সংবাদটা পুলিশমহলে প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গে কান্দাই শহরে ঘরে ঘরে প্রচার হয়ে পড়ে। হাঙ্গেরী কারাগারের অভ্যন্তরে সুড়ঙ্গপথ আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশমহলে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিলো, তারপর যখন মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও ভূগর্ভ সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেছিলেন তখন পুলিশমহল এবং কান্দাইবাসী সবাই বিপুল এক উন্মাদনা নিয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। সুড়ঙ্গপথটা কিভাবে সৃষ্টি হলো, এবং দস্যু বনহুর কিভাবে সেই সুড়ঙ্গপথে উধাও হলো, এবং তার শেষ কোথায়? সুড়ঙ্গপথটা নিয়ে নানা জনের মনে নানা ধরনের চিন্তার উদ্ভব হচ্ছিলো। শুধু চিন্তাভাবনা করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা, এটা একটা আলোচনার বস্তু হয়েছিলো সবার।

যখন পুলিশমহলের ওয়্যারলেসে জানতে পারলো দস্যু বনহুরকে মিঃ হারুন এবং তার সঙ্গীরা নিহত করতে সক্ষম হয়েছেন তখন সমস্ত কান্দাই শহরে এবং শহরতলী ও গ্রামাঞ্চলগুলোতে সংবাদটা ছড়িয়ে পড়লো বেতারযন্ত্রে।

এমন কি চৌধুরীবাড়িতেও সংবাদটা পৌঁছতে বিলম্ব হলো না।

নূর তার শয়নকক্ষে শয্যায় শুয়ে শুয়েই রেডিও সংবাদ শুনলো। কথাটা তার কানে যেন গরম সীসা ঢেলে দিলো। এ সংবাদ তাকে কতখানি আঘাত করলে তা নূর হৃদয় দিয়ে অনুভব করলো।

দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করাই ছিলো তার স্বপ্ন, তার বাসনা, সাধনা। সার্থকও সে হলো কিন্তু একি বিস্ময়, দস্যু বনহুর তার পিতা। যে পিতা তার ধ্যান জ্ঞান, তার অন্তরের একনিষ্ঠ এক মহান পুরুষ, তার সেই পিতা দস্যু... না না, সে কথা নূর মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারেনি। তার পিতার মত সুন্দর মহৎ উদার ব্যক্তি সে জীবনে দ্বিতীয় জন দেখেনি অথচ যা মিথ্যা নয় একেবারে আকাশের মত সত্য নূর বনহুরকে আটক করার পর যখন তার মুখমন্ডল থেকে আবরণ খুলে ফেলা হলো এবং প্রকাশ পেলো কে এই দস্যু বনহুর তখন নূর শুধু আশ্চর্যই হয়নি, হয়েছিলো হতভম্ব কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলো সে।

দস্যু বনহুর যে তার জন্মদাতা পিতা এ কথা নূর ভাবতে পারছিলো না। মাথাটা সেদিন বো বোঁ করে ঘুরেছিলো কিন্তু উপায় ছিলো না কিছু।

পিতাকে নূর গ্রেপ্তার করেছিলো এবং হাঙ্গেরী কারাগারে তাকে বন্দী করেছিলো।

তারপর তাকে নূর সম্বিৎহারার মত স্তব্ধ হয়ে পড়েছিলো। কথা যেন তার ফুরিয়ে গেছে সেদিনের পর থেকে।

প্রথম দিন মায়ের কাছে ঝড়ের বেগে গিয়ে হাজির হয়েছিলো, সে দিন যা মুখে এসেছিলো তাই সে বলেছিলো কিন্তু তারপর আর কোনো দিন কোন প্রশ্ন করতে পারেনি, এমন কি মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মত মনের অবস্থা ছিলো না তার।

মনিরা নিজে এসেছিলো নূরের কাছে।

মাথায় হাত বুলিয়ে নীরবে সান্তনা খুঁজেছে। কিন্তু সেও মুখে কিছু বলতে পারেনি।

যখন নূর জানতে পারলো মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও ও তার দলবল দস্যু বনহুরকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন তখন নিজের অজ্ঞাতে বুকটা প্রচন্ডভাবে ধক করে উঠলো। দুচোখ ঝাপসা হয়ে এসেছিলো তার। ভাগ্যিস ঐ মুহূর্তে কেউ তার পাশে ছিলো না, থাকলে নূর নিজকে কিছুতেই সংযত রাখতে পারতো না। দস্যু হলেও তার পিতা। কেমন করে নিজ পিতার নিহত সংবাদ স্বাভাবিকভাবে হজম করবে সে।

সংবাদটা কানে যেতেই নূর দুহাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরেছিলো, একটা দীপ্ত সুন্দর বলিষ্ঠ মুখ ভেসে উঠেছিলো তার চোখের সামনে। ছায়াছবির মত একটার পর একটা দৃশ্য ভেসে উঠেছিলো তার মনের পর্দায়। পিতার বিভিন্ন দিনের আচরনের কথা মনে পড়তে লাগলো, সেই ছোট্টবেলার কথা… কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় দুগাল ভরিয়ে দিয়ে কত আদর করেছে। কতদিন কত সুন্দর সুন্দর জিনিস এনে দিয়েছে। কত রকম জামাকাপড় পোশাক পরিচ্ছদ। শুধু তাই নয় তাকে মানুষ করে গড়ে তোলার সেকি প্রচেষ্টা–সবের পেছনে ছিলো তার আব্বার প্রাণঢালা চেষ্টা, তাই তো সে আজ বিদেশ থেকে এত বড় ডিগ্রী নিয়ে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে।

দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হবার পর থেকেই নূর নীরব হয়ে পড়েছিলো। তেমন করে কারও সঙ্গে কথা বলতে না বা কোথাও বড় একটা যেতো না।

যখন শুনলো সে, কান্দাই ডাকবাংলোয় ফিরে এসেছেন মিঃ হারুন এবং তার দলবল এবং তারা সঙ্গহীন অবস্থায় ফিরে এসেছেন, কে বা কারা তাদের পোঁছে দিয়ে গেছে। ঘটনাটা নূরকে শুধু বিস্মিতই করলো না, বেশ ভাবিয়ে তুললো। মিঃ হারুন এবং তার সঙ্গীরা হাঙ্গেরী কারাগারের সেলের তলদেশের সুড়ঙ্গপথে ভূগর্ভে প্রবেশ করার পর থেকে সে ভীষণ এক উদ্বিগ্নতার মধ্যে মুহূর্ত গুণছিলো। একটা ভয়ঙ্কর কোনো সংবাদের আশায় অপেক্ষা করছিলো সে। ওয়্যারলেসে হঠাৎ যখন জানতে পারলো দস্যু বনহুর নিহত হয়েছে তখন নূর স্থির থাকতে পারেনি। আসন ত্যাগ করে চঞ্চলভাবে পায়চারী শুরু করে দিয়েছিলো। নিজের অজ্ঞাতে দুচোখ তার ঝাপসা হয়ে। এসেছিলো। অনেক কষ্টে নিজেকে নূর সংযত করেছিলো তখন।

কিন্তু ডাকবাংলোর ব্যাপারে যখন নূরের কানে এলো তখন সে স্থির থাকতে পারল না। নিজের জামাটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গাড়ি নিয়ে।

কান্দাই ডাকবাংলো শহরের এক প্রান্তে, তাই গাড়ি নিয়ে পৌঁছতে কিছু বিলম্ব হলো।

নূর পৌঁছতেই মিঃ আহমদ তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন,–আসুন মিঃ নূর। আপনার জন্য আমরা প্রতীক্ষা করছি।

নূর নীরবে এসে দাঁড়ালো মিঃ হারুনের শয্যার পাশে।

মিঃ হারুন বললেন—-বসুন মিঃ নূর।

নূর আসন গ্রহণ করলো।

তাকিয়ে দেখলো কক্ষে প্রায় বিশ পঁচিশ জন লোক মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাওকে ঘিরে বসে আছেন।

এদের সকলেই নূরের পরিচিত দুচার জন ছাড়া।

বেশি সংখ্যক ব্যক্তি পুলিশ অফিসার এবং ডি আই বি বিভাগের লোক। কিছু সাংবাদিক এবং দুচার জন যারা অপরিচিত বলে মনে হচ্ছে তারা কান্দাইয়ের সুধীজন।

নূর নীরবে আসন গ্রহণ করলেও তার দৃষ্টি সবকিছু লক্ষ্য করছিলো। মিঃ হারুন এবং অন্যান্য সবাই সংজ্ঞা লাভ করলেও এখনও তাদের চেহারা স্বাভাবিক হয়নি। এলোমেলো চেহারা, চোখগুলো লাল।

নুর কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলো না, কারণ তার কণ্ঠ কে যেন টিপে ধরছে বলে মনে হচ্ছে। অনেক প্রশ্নই তার মনে জাগছিলো তবু নীরব রইল সে।

কানে এলো মিঃ আহমদের কণ্ঠস্বর–স্যার, দস্যু বনহুরকে আপনারা হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন এটা শুধু পুলিশমহলের জয় নয়, গোটা কান্দাইবাসীর জয়। এতোবড় ঘটনা যে সম্ভব হবে ভাবতে পারিনি। স্যার, আপনারা এতদিনে

কান্দাইবাসীদের ভয়মুক্ত করলেন। কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন মিঃ আহমদ।

মিঃ হারুন বললেন–আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে তার জন্য আমরা নিজেরাও কম আনন্দিত নই।

একজন সাংবাদিক বললেন–স্যার, এতক্ষণ আপনাদের শারীরিক অবস্থা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। এবার দস্যু বনহুরের হত্যা ব্যাপার নিয়ে কিছু প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করি?

মিঃ হারুন একটু কেশে নড়ে বসলেন।

তিনি সকলের অলক্ষ্যে একবার মিঃ শংকর রাওয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

শংকর রাও কিন্তু তাকিয়ে ছিলেন মিঃ হারুনের মুখের দিকে।

শুধু শংকর রাও নন, অন্যান্য পুলিশ অফিসার যারা মিঃ হারুনের সঙ্গে ছিলেন তারাও এ–ওর মুখে তাকিয়ে দেখলেন।

নূরের দৃষ্টি এড়ালো না এ ব্যাপারে। সে মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করছিলো সবকিছু।

মিঃ হারুন বললেন–নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে পারেন।

সাংবাদিক তার কলম বাগিয়ে ধরে বললেন–হাঙ্গেরী কারাগারের তলদেশের সুড়ঙ্গে প্রবেশ করার পর প্রথম কি ঘটেছিলো বা কেমন দেখলেন বলুন?

মিঃ হারুন বললেন–আমরা সুড়ঙ্গে প্রবেশ করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সব কথা আপনারা জানেন এবং দেখেছেন।

হাঁ, আমরা কয়েকজন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলাম সে সময়, যদিও হাঙ্গেরী কারাগারে প্রবেশের অনুমতি সাধারণের ছিলো না বা নেই, তবু আমরা সাংবাদিক হিসেবে প্রবেশ করার অধিকার পেয়েছিলাম।

তাহলে শুনুন আপনারা। আমরা হাঙ্গেরী কারাগারের তলদেশের সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করলাম, আমি শংকর রাও এবং যাদের এখানে দেখছেন তারা কয়েকজন

পুলিশ অফিসার। আমরা সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করবার পূর্বমুহূর্তে নিজেদের প্রস্তুত করে নিলাম মৃত্যুর জন্য, কারণ সুড়ঙ্গে কি আছে, কেমন ঘটনার সম্মুখীন আমরা হব, এসব নিয়ে আমাদের কিছু দুশ্চিন্তা ছিলো।

সাংবাদিকটি বললেন–হাঁ, এটা স্বাভাবিক। মৃত্যুকূপে প্রবেশ করবার পূর্বমুহূর্তে যেমন মানুষের মনের অবস্থা হয় ঠিক তেমনি হয়েছিলো আপনাদের মনের অবস্থা, এটা আমরা বেশ অনুভব করেছিলাম। যাক, আপনারা জয়যুক্ত হয়ে ফিরে এসেছেন এটা শুধু আপনাদের মঙ্গল নয় আমাদের সকলেরই মঙ্গল এবং শুভ। বলুন তারপর?

তারপর সুড়ঙ্গপথে অতি সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হলাম। প্রত্যেকের হাতে একটা করে টর্চ লাইট ছিলো, কাজেই সুড়ঙ্গে অন্ধকার হলেও সব আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। কঠিন পাথর কেটে সুড়ঙ্গপথ তৈরি করা হয়েছে। ভীষণ অন্ধকার, যে কোনো মুহূর্তে আমাদের মাথাটা ঠুকে যাবার ভয় ছিলো, কিন্তু টর্চের আলো ফেলে অগ্রসর হচ্ছিলাম বলে তেমন কোনো বিপদের সম্মুখীন হলাম না। সেকি বিস্ময়কর সুড়ঙ্গপথ, আমরা টর্চের আলোতে দেখতে পাচ্ছি সিমেন্টের প্লাষ্টার করা সমতল সুড়ঙ্গ দেয়াল। এতটুকু উঁচুনীচু নেই কোথাও। যদিও কোনো সিমেন্টের কারবার ছিলো না, শুধু পাথর আর মাটি এমন কোনো মেশিন দিয়ে সুড়ঙ্গপথ তৈয়ার করা হয়েছিলো যা অতি আশ্চর্যজনক। আমরা এগিয়ে চলেছি, পথ প্রশস্ত না হলেও চলতে আমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছিলো না। একটু থামলেন মিঃ হারুন।

সাংবাদিকগণ নোট করে নিচ্ছিলেন।

মিঃ হারুন বলে চলেছেন– সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গপথ। যেন তার শেষ নেই। বহুদূর এগিয়ে গিয়েও কোনোকিছু নজরে পড়লো না। অবশ্য আমরা অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগুচ্ছিলাম। না জানি কোথায় কোন বিপদ ওৎ পেতে আছে কে জানে। তা ছাড়া আমরা দস্যু বনহুররের খোঁজ করছি, তাই ভীষণ উত্তেজনার সঙ্গে আছি। আরও কিছু অগ্রসর হবার পর হঠাৎ দেখলাম পথ বন্ধ, সুড়ঙ্গের কোনো মুখ নেই যে এগুবো। কিছুটা ভড়কে গেলাম আমরা। আশংকা হলো না জানি কোন মুহূর্তে বনহুর দলবল নিয়ে আক্রমণ করে বসে যদিও আমরা সেজন্য প্রস্তুত ছিলাম। তেমন কোনো আক্রমণ হলো না, তাই আমরা পথের সন্ধান করছি এমন সময় একটা কান্ড ঘটে গেলো, মানে বিস্ময়কর ঘটনা....

থামলেন মিঃ হারুন।

যা হোক এবার মিথ্যার জন্য প্রস্তুত হতে হচ্ছে, মিথ্যা বলা অভ্যাস নেই তবু মিথ্যা বলতে হবে। মিঃ হারুন তাকালেন মিঃ শংকর রাও এবং যারা তার সঙ্গে ছিলেন তাদের মুখের দিকে। মনের মধ্যে গুছিয়ে নিলেন যেভাবে তারা দলবলসহ পরামর্শ করে রেখেছিলেন।

মিঃ হারুন নিজকে সংযত করে নিয়ে বলতে শুরু করলেন যেন তার মুখোভাবে মিথ্যা প্রকাশ না পায়। বললেন–আমরা যখন সুড়ঙ্গের মধ্যে পথ খুঁজছি তখন হঠাৎ এক অট্টহাসি ভেসে এলো।

সেকি ভীষণ আর কঠিন হাসির শব্দ।

তারপর?

শব্দটা কোন পথে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করছে তা জানার জন্য আমরা সবাই কান পাতলাম। প্রত্যেকের হাতে পাওয়ারযুক্ত টর্চ লাইট ছিলো তাই জ্বেলে আমরা দেখতে লাগলাম। কিন্তু কিছুই নজরে পড়লো না। তখন আমরা ফিরে আসার জন্য ফিরে দাঁড়ালাম। হঠাৎ সেই মুহূর্তে আমাদের সামনে এক জমকালো মূর্তির আবির্ভাব ঘটলো।

আমরা স্পষ্ট দেখলাম সেই মূর্তিটাই এতক্ষণ অট্টহাসি হাসছিলো। সেই কণ্ঠস্বর। জমকালো মূর্তিটা একপাশে দেয়ালের দিকে সরে গেলো। হাত বাড়ালো সে দেয়ালের গায়ে। হয়তো সেখানে সুইচ বা ঐ ধরনের কিছু ছিলো, যা দিয়ে গুহায় প্রবেশ ও বের হবার পথ করা যায়। কিন্তু আমরা তাকে সে সুযোগ দিলাম না। মুহূর্ত বিলম্ব না করে গুলী ছুড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পুলিশ অফিসার এবং সশস্ত্র পুলিশও গুলী ছুঁড়লো।

প্রথমে জমকালো মূর্তি এতটুকু টলোনা, পর পর অনেকগুলো গুলী তার উপর বর্ষিত হলো তখন টলতে লাগলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢলে পড়লো... থামলেন মিঃ হারুন। এত বড় মিথ্যা কথা বলতে তার বিবেকে বাঁধছিলো তবু না বলে কোনো উপায় নেই, কারণ দস্যু বনহুর তাঁদের সবাইকে জীবন্ত অবস্থায় মুক্তি দিয়েছে তার মৃত্যু ঘোষণার জন্য

কি ভাবছেন স্যার? বললেন–একজন সাংবাদিক।

অপর একজন বললেন–স্যার, আপনি কি মনে করেন দস্যু বনহুর আপনাদের নিক্ষিপ্ত গুলীর আঘাতে মৃত্যুবরণ করছে।

হাঁ।

আপনারা কি তার মৃতদেহ পরীক্ষা করেছেন?

মিঃ হারুন তাকালেন মিঃ শংকর রাওয়ের দিকে।

মিঃ শংকর রাও বুঝতে পারলেন মিঃ হারুন সরাসরি এতোবড় মিথ্যা বলতে সংকুচিত হচ্ছেন তাই তিনি মিঃ হারুনকে সাহায্য করলেন, বললেন তিনি–হাঁ, আমরা সবাই সেই জমকালো মূর্তির দেহ পরীক্ষা করে বুঝতে পারলাম সে মৃত্যুবরণ করেছে।

অপর একজন সাংবাদিক বললেন—-দস্যু বনহুরকে আপনারা হত্যা করতে সক্ষম হলেন, লাশটা নিয়ে আসা কি সম্ভবপর ছিলো না?

না, কারণ অত্যন্ত দুর্গম সুড়ঙ্গপথ। আমরা নিজেরাই অতিকষ্টে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছি। কথাটা বললেন মিঃ হারুন।

সাংবাদিকদের একজন বললেন–আপনারা কি ভাবে ফিরে এলেন জানবার জন্য আমরা উদগ্রীব রয়েছি কারণ আপনাদের ফিরে আসাটা মোটেই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না, কারণ আপনাদের যখন এই ডাকবাংলোয় দেখা গেলো তখন সবাই আপনারা সংজ্ঞাহারা…

হাঁ, একথা সত্যি। আমাদের ফিরে আসার ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয় এবং এ ব্যাপারে আমরা নিজেরাও বেশ আশ্চর্য হয়েছি। কারণ আমরা সুড়ঙ্গপথে এগোলেও ঠিক একেবারে হাঙ্গেরী কারাগারের সেল পর্যন্ত পৌঁছতে পারিনি। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম তারপর আমরা সবাই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলাম, এরপর আর কিছুই মনে নেই আমাদের।

তাহলে ওয়্যারলেসে দস্যু বনহুরের নিহত সংবাদটা আপনি কখন পাঠিয়েছিলেন? বললেন, একজন প্রবীণ সাংবাদিক।

মিঃ হারুন একটু ভেবে নিয়ে বললেন–যখন আমরা দস্যু বনহুরের রক্তাক্ত দেহ পরীক্ষা করে বুঝতে পারলাম সে মৃত্যুবরণ করেছে তখন।

তাহলে সুড়ঙ্গ থেকেই আপনি সংবাদটা জানিয়েছিলেন। বললেন প্রথম সাংবাদিক।

হাঁ, মিঃ হামবার্ট লিয়ং, দস্যু বনহুর নিহত সংবাদটা আমিই ওয়্যারলেসে জানিয়েছিলাম। বিশেষ করে সংবাদটা জানানোর জন্য দ্রুত কাজ করেছিলাম।

এখন সবকিছু অবগত হলাম, কৌশলে অজ্ঞান করা হয়েছিলো আপনাদের এবং কৌশলে সুড়ঙ্গ থেকে সরানো হয়েছিলো।

হাঁ, তাই মনে হচ্ছে। কারণ আমরা হাঙ্গেরী কারাগারকক্ষে ফিরে না আসতেই সংজ্ঞা হারিয়েছিলাম। আনমনাভাবে কথাটা বললেন মিঃ হারুন। তারপর একটু থেমে বললেন–কে বা কারা আমাদের অজ্ঞান করেছিলো জানি না এবং কি ভাবে সুড়ঙ্গ থেকে এই সুদূর ডাকবাংলোয় এলাম তাও জানি না।

আপনাদের কি দস্যু বনহুর নিহত ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আছে? বললেন– সাংবাদিক মিঃ আর এ কিবরিয়া।

এতক্ষণ তিনি নিশ্চুপ ছিলেন, শুধু শুনে যাচ্ছিলেন কথাগুলো এবং যা প্রয়োজন নোট করছিলেন। চোখেমুখে তার ভীষণ এক উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠেছে। মিঃ আর এ. কিবরিয়া দক্ষ সাংবাদিক। তিনি বহুদিন কান্দাইয়ের বাইরে কাটিয়েছেন, ফিরে এসেছেন অল্প কিছুদিন হলো।

ফিরে এসেই বনহুর সম্বন্ধে তার কানে নানা কথা প্রবেশ করেছে। অবশ্য আগে থেকেই তিনি এ ব্যাপারে বা দস্যু বনহুরকে নিয়ে অনেক কথাবার্তা শুনে এসেছেন, অনেক সংবাদ তার কর্ণগোচর হয়েছে। এখন তিনি প্রকাশ্যে সব দেখছেন।

সব যেন বিস্ময়কর ঘটনা।

মিঃ কিবরিয়া ঘটনাগুলো গভীরভাবে তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করছেন। সব যেন রহস্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে তার। দস্যু বনহুরের নাম ও তার কার্যকলাপের কিছু কিছু তার জ্ঞাত ছিলো। আজ আরও কিছু জ্ঞাত হলেন তিনি।

দস্যু বনহুর নিহত হয়েছে অথচ কৌশলে কে তাদের সুড়ঙ্গে সংজ্ঞালুপ্ত করলো এবং ডাকবাংলোয় পৌঁছে দিলো, এ নিয়ে নানা রকম চিন্তার উদ্ভব হচ্ছে সবার মনে।

. তবু আর বেশি কিছু জানা সম্ভব নয়। তাছাড়া পত্রিকায় প্রকাশ ব্যাপারে এটুকুই যথেষ্ট মনে করে সাংবাদিকগণ বিদায় গ্রহণ করলেন।

মিঃ আহমদ এবং মিঃ নূর রয়ে গেলেন।

অন্যান্য পুলিশ অফিসার বিদায় নিলেন তখনকার জন্য।

নূর গম্ভীর মুখে বসেছিলো।

মিঃ আহমদ সরে বসলেন মিঃ হারুনের পাশে।

এক সময় মিঃ হারুন কান্দাইয়ের পুলিশপ্রধান ছিলেন এবং তিনি দীর্ঘ সময় এ দেশে স্থায়ীভাবে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি অন্যান্য দেশে পুলিশপ্রধান হিসাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন।

উপস্থিত তিনি দস্যু বনহুরের গ্রেপ্তার ব্যাপার নিয়ে কান্দাই এসেছেন এবং মিঃ শংকর রাওয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করছেন।

যদিও এখন কান্দাই এসে পুলিশপ্রধান হিসেবে রয়েছেন মিঃ আহমদ তবুও মিঃ হারুনকে যথেষ্ট সমীহ এবং শ্রদ্ধা করেন কারণ বয়সেই তিনি প্রবীণ নন, অভিজ্ঞতায় মিঃ আহমদ মিঃ হারুনের চেয়ে অনেক কম। কাজেই মিঃ হারুন যখন সুদূর আরাকান থেকে কান্দাই এলেন তখন মিঃ আহমদ খুশি হয়ে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং প্রতিটি কাজে তিনি তার পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

মিঃ আহমদ যখন মি হারুনকে তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে সংজ্ঞাহারা অবস্থায় দেখতে পেলেন তখন তার বিস্ময়ের সীমা ছিলো না, গভীরভাবে মুষড়েও পড়লেন তিনি। সব যেন কেমন যোলাটে রহস্যময় বলে মনে হচ্ছিলো তার কাছে। হাজার হলেও মিঃ আহমদ নতুন এসেছেন কান্দাই শহরে।

মিঃ আহমদ মিঃ হারুনের পাশে বসে বললেন–স্যার, এখন তো কোনো অসুবিধা বোধ করছেন না?

না। বেশ ভাল আছি।

আপনার বক্তব্য থেকে যা বোঝা গেলো তা বেশ রহস্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।

হা।

স্যার, আপনার কি মনে হয় দস্যু বনহুর সত্যিই নিহত হয়েছে?

তাই মনে হয়, কারণ দস্যু বনহুরকে আমরা রক্তাক্ত দেহে দেখেছি এবং প্রাণহীন অবস্থায়....

তাহলে?

হাঁ, আমি নিজেও কম আশ্চর্য হইনি। তাহলে কে বা কারা আমাদের অজ্ঞান করে পরে এই ডাকবাংলোয় পৌঁছে দিয়েছে? তবে এটুকু আমার মনে হয় দস্যু বনহুর তো একা নয়, তার বিরাট দল আছে, এ তাদেরই কাজ।

হতে পারে, কিন্তু তারা এত সহানুভূতি দেখানোর কারণ কি?

মিঃ আহমদের কথাটা অহেতুক নয়, কারণ দস্যু বনহুরকে যারা নিহত করলো তারই দলবল দয়াপরবশ হয়ে সর্দারের হত্যাকারীদের এভাবে একেবারে ডাকবাংলোয় সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়ে দিয়ে যাবে, এ যেন ধারণার বাইরে। দস্যু বনহুরের দলবল বরং তাদের সবাইকে হত্যা করতে পারতো, কিন্তু আশ্চর্য তারা তাদের শত্রুদলকে হত্যা না করে এভাবে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

সব রহস্যময় বটে।

নূর এতক্ষণ নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছিলো এবং সব দেখছিলো। তার মন প্রসন্ন হলো, কারণ দস্যু বনহুরের নিহত ব্যাপার নিয়ে সন্দেহ আছে তাহলে।

মিঃ হারুন আর মিঃ শংকর রাও জানেন নূরের আসল পরিচয়–কে সে। আর জানেন বলেই তারা আজ নূরের সঙ্গে স্বচ্ছভাবে কথা বলতে পারছেন না।

নূরই কথা বললো–স্যার, আপনাদের অবস্থা এত সঙ্গীন হবে ভাবতে পারিনি। তবে জয়যুক্ত হতে পেরেছেন বলে আমি খুশি হয়েছি।

মিঃ নূর, আপনি জানেন দস্যু বনহুর আপনার কে তবু আপনি এ কথা বলতে পারলেন বলে আমি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি। কথাগুলো অতি নিম্নকণ্ঠে বললেন মিঃ হারুন।

মিঃ হারুনের নিচু গলায় কথাগুলো বলার কারণ ছিলো। তা হলো মিঃ শংকর রাও এবং তিনি ছাড়া দলের কেউ জানেন না দস্যু বনহুরের সঙ্গে প্রখ্যাত ডিটেকটিভ মিঃ নূরুজ্জামানের কি সম্পর্ক। এ কথা প্রচার না হওয়াই বাঞ্চনীয় বলে মনে করে কান্দাই পুলিশমহল এবং সে জন্যই এতদিন অতি সাবধানে ব্যাপারটা গোপন রেখেছেন প্রশাসন বিভাগ।

যা হোক মিঃ হারুন যতদূর সম্ভব নিম্নকণ্ঠে নূরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন।

তারপর এক সময় ফিরে এলো নূর নিজ বাসভবনে।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই শুনতে পেলো দাদীমার কণ্ঠস্বর। তিনি বলছেন– বৌমা, আমার। মন বলছে সব মিথ্যা, আমার মনির মরেনি। মরতে পারে না, আমি জানি সে কোনো অন্যায় করেনি, তাই তাকে কেউ হত্যা করতে পারবে না

মায়ের কণ্ঠস্বর–নূর তার আব্বুকে হত্যা করেছে।

এ সব তুমি বিশ্বাস করো না বৌমা।

মামীমা, আমি কিছুতেই মনকে সান্ত্বনা দিতে পারছি না। নূর শপথ করেছিলো সে তার। আব্বুকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করবে।

নূর আর থাকতে পারলো না, সে কক্ষে প্রবেশ করে বলে উঠলো–আম্মি, তুমি ভুল বলছে–আমি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করবে শপথ গ্রহণ করেছিলাম–আব্বুকে নয়। একটু থেমে গম্ভীর কণ্ঠে বললো–আমি আমার শপথ রক্ষা করেছি।

নূর এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মনিরা দ্রুত ছুটে এসে জাপটে ধরে নূরের জামার আস্তিন। রাগতকণ্ঠে বলে সে–কি অপরাধ সে করেছিলো তোর? কি অপরাধ সে করেছিলো তোর? কি অপরাধ সে করেছিলো বল? কেন, কেন তুই তাকে গ্রেপ্তার করলি? জবাব দে নূর, জবাব দে।

নূর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো–আম্মি, তোমাকে বলেছি আমি আব্বুকে গ্রেপ্তার করিনি, করেছি দস্যু বনহুরকে।

এবার মরিয়ম বেগম বললেন–বড় নিষ্ঠুর হয়েছিস নূর। তুই জানি না তোর আব্বুর জন্য তোর আম্মির মনে কত দুঃখ, কত ব্যথা।

সব জানি কিন্তু কোনো উপায় ছিলো না, কারণ দোষীকে শাস্তি পেতেই হবে। স্থিরকণ্ঠে বললো নূর।

তুই তোর আব্বুকে দোষী অপরাধী বলছিস? নূর, তুই এত বড় কথা বলতে পারলি? বললেন মরিয়ম বেগম।

আজ মরিয়ম বেগমকে বেশ শান্ত মনে হচ্ছে। অন্য দিন হলে কেঁদে কেটে একাকার করতেন।

নূর স্থির দৃষ্টি মেলে তাকালো দাদীমার দিকে, বললো তারপর–দাদীমা, এ কথার জবাব তুমি নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো। অবশ্য মায়ের কাছে সন্তান সব সময় নিরপরাধীই, যত দোষ করুক না কেন।

নূর, তোর আব্বু আমার সন্তান না হয়ে যদি সে অপর এক ব্যক্তি হতো তবু তার যে কার্য পরিচয় রয়েছে তাতে সে মোটেই অপরাধী নয়, কারণ সে তো অন্যায়ভাবে কাউকে আঘাত করেনি। আমার মনির বড় দয়ালু, আমার মনিরের মত মানুষ হয় না দাদু।

কিন্তু তোমার মনির অপরাধী, এ কথা তোমাকে স্বীকার করে নিতেই হবে এবং তার উপযুক্ত শাস্তি সে লাভ করেছে। তাকে পুলিশ মহল হত্যা করেছে।

না না, এ কথা সত্য নয়। আমার মনিকে কেউ হত্যা করতে পারে না। আমার মন বলছে। সে বেঁচে আছে। কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বললেন মরিয়ম বেগম।

মনিরা তাকালো শাশুড়ির মুখের দিকে। তার চোখ দুটো দিয়ে বিগলিত অশ্রু ঝরছে।

বললো নূর–আম্মি, তুমিও কাঁদছো? অপরাধীর শাস্তি হবেই এ তুমি জানো...

নূর।

বলো আম্মি?

সত্যি এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

এ পৃথিবী বৈচিত্রময় তা তুমি জানো। তাই মুহূর্তে মুহূর্তে রং বদলায়। আকাশ থেকে কখন কোন তারা খসে পড়লো কে তার হিসাব রাখে। কথাগুলো শান্তকণ্ঠে বললো নূর।

মনিরা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

নূর এসে মাকে কাছে টেনে নিয়ে পিতৃ আদরে বললো–আমি থাকতে কেন তুমি উতলা হচ্ছো আম্মি? এ বিশাল বিশ্বে কেউ কি চিরদিনের জন্য বাঁচতে এসেছেঃ আব্বুর জন্য আমার নিজেরও কম কষ্ট হচ্ছেনা তবু আমি সংযত আছি।

আমি যে পারছি না বাপ। কত ব্যথা এ বুকে তুই তা বুঝলি না।

আম্মি আম্মি সব বুঝি, যদিও এতদিন তেমন করে কিছু জানতাম না। এবার সব জেনেছি....একটু থেমে বললো নুর–কেন আমার কাছে সব গোপন করেছিলে? কেন এতদিন সব খুলে বলোনি? যদি বলতে হয়তো এমন হতো না– তোমার জীবনকে এমন বিষময় হতে দিতাম না।

মরিয়ম বেগম বললেন–নূর, কেমন করে তোর আমি তোকে বলবে তোর আব্বু একজন দস্যু...

হয়তো আমার জীবনে এটা ভীষণভাবে আঘাত হানতো তবু আমি তাকে শুধরে নিতে চেষ্টা করতাম কিন্তু সে সুযোগ আমার জীবনে এলোনা। তাকে গ্রেপ্তার করার পর বুঝলাম–পেলাম তার আসল পরিচয়।

থামলো নূর।

মুখমন্ডল তার থমথমে গম্ভীর।

চোখ দুটো কিছুটা রক্তাভ।

ঠোঁট দুটো কাঁপছিলো।

মরিয়ম বেগম বললেন–নূর তোর জীবনে যেন তোর আব্বুর ছায়াপাত না ঘটে সে জন্যই আমরা প্রচেষ্টা চালিয়েছি। আর সে জন্যই তোকে কিছু জানাই নাই।

নূর বললো–তোমরা ভুল করেছিলে?

না ভুল নয় নূর। তোর আব্বু জানতেন তুই জানলে তার প্রতি তোক ঘৃণা জন্মাবে আজ যা জন্মেছে…

আম্মি আমি আব্বুকে ঘৃণা করছি এ কথা তোমাকে কে বললো? আব্বুর কার্যকলাপ আমি অপছন্দ করতে পারি তাই বলে আব্বুকে আমি ঘৃণা করতে পারি না। আব্বু আমার শ্রদ্ধার পাত্র।

নূর এ কথা সত্যি বলছিস?

হাঁ আম্মি।

নূর তোর আব্বুকে পুলিশবাহিনী হত্যা করেছে। আর কোন দিন সে ফিরে আসবে না। আমি কোনোদিন তাকে বলতে পারবো না তোর কথা।

আম্মি। কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো নূর।

মরিয়ম বেগম আর মনিরা এক সঙ্গে তাকালেন নুরের মুখের দিকে।

বললো নূর–ধৈর্য ধরো আম্মি। বলেছি তো কখন কার ভাগ্যে কি ঘটবে কেউ জানেনা। আব্বুর ভাগ্যে যা ছিলো তা ঘটেছে।

নূর!

হা আম্মি।

*

দাদীমা, আমি আর নূর মিলে আরও কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা হয়, তারপর নূর নিজে ড্রাইভ করে নিয়ে চলে চৌধুরীবাড়িতে। আমি আর দাদীমাকে পৌঁছে

দেবে সে।

বেশ দীর্ঘ পথ।

প্রায় বিশ–বাইশ মাইল হবে নূরের বাংলো থেকে চৌধুরী বাড়ি। নূর যখন মা ও দাদীমাকে নিয়ে চৌধুরীবাড়ি পৌঁছলো তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে।

রাজ পথে আলোর মিছিল জ্বলে উঠেছে মশালধারী বিক্ষোভকারীদের মত। পথ যানবাহনে সরগরম।

নূর নিজে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলো।

আম্মি আর দাদী বসে আছেন গাড়ির পেছন আসনে। তারা কি ভাবছেন এ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই নূরের।

নূর আপনাতে আপনি বিভোর।

সে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করার পর যখন জানতে পারলে তার স্নেহময় পিতা স্বয়ং দস্যু বনহুর তখন তার মাথায় বজ্রপাতই শুধু হলো না, কে যেন তার বুকে সেল বিদ্ধ করলো।

নুর রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিলো বিস্ময়ে। এও কি সম্ভব। যাকে সে গ্রেপ্তার করার জন্য মনপ্রাণ সমর্পন করেছিলো, সেই দস্যু তার পিতা।

এতবড় অবিশ্বাসটাও তাকে মেনে নিতে হয়েছিলো সেদিন। কারণ নিজের চোখকে সে তো অবিশ্বাস করতে পারে না।

এত কঠিন নির্মটাকে তার মেনে নিতে হয়েছিলো অতি সহজে, যদিও নিজের চোখকে নূর ঐ মুহূর্তে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলো না।

তবুও তো করতে হয়েছিলো।

মেনে নিতে হয়েছিলো এত বড় অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা সত্য বলে। শুধু তাই নয়, নিজের মাথাটা তখন নত হয়ে পড়েছিলো আপনা আপনি, নুয়ে যাওয়া শক্ত খুঁটির মত।

নূর মরিয়ম বেগম আর মনিরাকে চৌধুরীবাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফিরে চললো। হঠাৎ একটা নির্জন গলি পেরিয়ে আসবার সময় একটা ছোরা এসে বিদ্ধ হলো গাড়ির পেছন আসনে।

একটু চমকে উঠলো নূর।

ফিরে না তাকালেও নূর বুঝতে পারলো কিছু একটা তার গাড়ির পেছন আসনে বসে পড়েছে। কিন্তু বস্তুটা কি তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো না। তবে একটা শব্দ তার কানে প্রবেশ করেছিলো যা তাকে কিছুটা আন্দাজ করতে বাধ্য করেছিলো, হয়তো বা ছোরা হবে। কারণ শব্দটা ঘচু করে উঠেছিলো সূতী কিছু বিদ্ধ হওয়ার মত।

নূর গাড়ির স্পীড আরও বাড়িয়ে দিলো। ততক্ষণে ওর চিন্তাধারার গতি ঘুরে গিয়েছিলো, নতুন এক উত্তেজনা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো ওকে।

গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিয়ে হ্যান্ডেল চেপে বসে রইলো নূর, যে কোনো মুহূর্তে এক্সিডেন্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই তার।

গাড়ি ছুটে চলেছে।

রাত বাড়ছে।

নূরের গাড়ির স্পীড বাড়ছে তার সঙ্গে সঙ্গে।

নূর যত এগুচ্ছে ততই তার গাড়ির পেছন আসনের বস্তুটার কথা বেশি করে তাকে উতলা করছে, এমন কি বস্তু যা তার কানে নতুন এক ধরনের শব্দ সৃষ্টি করেছে।

পথের দুপাশে লাইটপোষ্টগুলো দ্রুত সরে যাচ্ছে, তার সঙ্গে সরে যাচ্ছে অট্টালিকাগুলো যেন সারিবদ্ধ প্রহরীর দল।

এক সময় গাড়িখানা নূরের বাসভবনে পৌঁছে গেলো। ফটকের নিকট গাড়ি পৌঁছতেই দারোয়ান ফটক খুলে সরে দাঁড়ালো।

নুর ভাবলো এতক্ষণও জেগে আছে বেচারা। কিন্তু বেশিক্ষণ ওকে নিয়ে ভাবার সময় নেই, নূরের, গাড়ি বারান্দায় পৌঁছতেই ক্ষিপ্র গতিতে গাড়ি থেকে নেমে পেছন আসনের দরজা খুলে সে ঝুঁকে পড়লো।

গাড়ি বারান্দার উজ্জ্বল আলোতে নূর স্পষ্ট দেখলো পেছন আসনে গাঁথা রয়েছে একখানা সূতীক্ষ্ণধার ছোরা।

নূর ছোরাখানা তুলে নিলো হাতে।

বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো ছোরাখানা শুধু নয় তার বাটে গাঁথা আছে একটা লাল রঙের চিঠি। নূর বিলম্ব না করে ছোরাসহ চিঠিখানা নিয়ে উঠে গেলো দ্বিতলে।

নিজের কক্ষে প্রবেশ করে আলো জ্বালাতেই চমকে উঠলো নর। টেবিলে তার টেপরেকর্ড বক্সটা খোলা অবস্থায় রয়েছে। পাশে তার এসট্রে, এসট্রের মধ্যে একটা অর্ধদগ্ধ সিগারেট গোঁজা। অর্ধদগ্ধ সিগারেট থেকে তখনও ঘোয়া নির্গত হচ্ছে।

আশ্চর্য হলো নূর।

গাড়ির মধ্যে ছোরা নিক্ষেপ, ছোরার সঙ্গে চিঠি গাঁথা। কক্ষে প্রবেশ করে আরও বিস্ময়, খালি টেবিল টেপরেকর্ড এলো কি করে। টেপরেকর্ড বক্সটাই শুধু ভোলা নয় পাশের সিগারেট কেসে অর্ধদগ্ধ সিগারেট গোজা রয়েছে।

নূর সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কক্ষের চারদিক দেখে নিলো। গভীর একটা সন্দেহ তার মনে আছন্ন করে ফেলছে। নিশ্চয়ই তার কক্ষে তার অবর্তমানে কেউ প্রবেশ করেছিলো, যে টেপরেকর্ড বের করেছিলো এবং বসে বসে নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট পান করেছিলো।

সে কে হতে পারে?

নূর বেশিক্ষণ ভাবতে পারলো না বা ভাববার সময় তার ছিলো না। হাতে তার একটা বিস্ময়কর ছোরা আর চিঠি।

নূর চিঠিখানা মেলে ধরলো।

উজ্জ্বল আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চিঠির পাতা। কোন লেখাই নেই শুধু লাল রঙের একটা সাদা কাগজ, মাঝামাঝি একটা সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরার ছবি।

আশ্চর্য হলো নূর।

একি, এত চিঠি নয়, কোনো সংকেত চিহ্ন।

শুধু ছোরার ছবি।

একটু ভাবলো নূর।

তারপর লাল কাগজখানা ভাঁজ করে রেখে দিলো টেবিলের একপাশে বসলো নূর টেপরেকর্ডসহ যে টেবিলখানা এতক্ষণ প্রতীক্ষা করছে তার জন্য।

নূর চেয়ারে বসে টেপরেকর্ড বক্সটা টেনে অন করে দিলো। ক্যাসেট রাই ছিলো টেপরেকর্ড অন্ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা কণ্ঠস্বর। নতুন এবং বিস্ময়কর গলার আওয়াজ। সর্দারকে হত্যা করেছো...তার উপযুক্ত শাস্তি তোমাকে পেতে হবে প্রস্তুত থেকো...শোনো নূর, তোমাকে আমি যে কোনো মুহূর্তে হত্যা করতে পারি কিন্তু তোমাকে সহজে হত্যা করবো না তোমাকে নিয়ে আমি সাপের খেলা খেলব আজকের মত চললাম...

কথাগুলো শেষ হয়ে গেল।

নূর বারবার টেপ বাজিয়ে কথাগুলো শুনলো। এই কণ্ঠস্বর তার সম্পূর্ন অপরিচিত নয়, কোথায় যেন এ কণ্ঠস্বর শুনেছে। এ কণ্ঠ অল্পবয়সী যুবকের তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কোথায় এ কণ্ঠস্বর শুনেছে ঠিক স্মরণ হচ্ছে না।

নূর টেপ বন্ধ করে পায়চারী শুরু করলো।

ভাবছে গভীরভাবে।

কার এ কণ্ঠস্বর।

কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে হলো না, মনে পড়লো কান্দাই জঙ্গলে এক যুবক তাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলো বনহুরের আস্তানায়। সেদিন নূর জানতো না কে এই বনহুর। মূরকে যখন বনহুরের দরবারকক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো তখন

জমকালো পোশাক পরিহিত এক মূর্তি সে দেখেছিলো, অদ্ভুত বিস্ময়কর সে চেহারা। কণ্ঠস্বর সে শুনেছিলো কিন্তু সেদিন সে চিনতে পারেনি ঐ কণ্ঠস্বর তার অতি আপনজনের।

নূর কি আজও ভাবতে পারছে, না স্বীকার করে নিতে পারছে দস্যু বনহুর তার আব্বু। কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারছে না, ভাবতেও পারছে না তার আব্বু এমন হতে পারে। অপরূপ মহৎ মহান পুরুষ তার আব্বু, সেই আব্বুকে স্বীকার করে নিতে হবে সে একজন বিশ্ববিখ্যাত দস্যু।

নূরের চোখের সামনে ছায়াছবির মত ভাসছে অনেকগুলো দৃশ্য যা সে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। কেমন দেখেছে নূর দস্যু বনহুরের আস্তানা। কেমন ভাবে তাকে আটক করা হয়েছিলো। কেমনভাবে চোখে কালো কাপড় বেঁধে তাকে গভীর অরণ্য মধ্যে কোনো এক সুড়ঙ্গপথে ভূগর্ভে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। বনহুরের নাম সে তখন শুনেছিলো আস্তানার অনুচরের মুখে। বার বার তারা সর্দার বলে আলাপ করছিলো। তাদের কথাবার্তায় বেশ বোঝা যাচ্ছিলো সর্দারকে অনুচরগণ কত শ্রদ্ধা এবং ভয় করে। তারপর যখন নূর স্বচক্ষে দেখলো জমকালো পোশাক পরা এক বিস্ময়কর মূর্তি, তাকে অভিবাদন জানালো অনুচরগণ নতমস্তকে... সব মনে আছে। আজ সে জানতে পেরেছে ঐ জমকালো পোশাকের নিচে যে লোকটা ছিলো সে তার পিতা।

কিন্তু সত্যই কি তার আব্বু নিহত হয়েছেন?

তাকে পুলিশমহল হত্যা করেছে?

নানা রকম চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগলো। ভাবছে এ কণ্ঠস্বর কোথায় শুনেছিলো যে কণ্ঠস্বর এই মুহূর্তে সে তার শয়নকক্ষে টেপরেকর্ডে শুনলো।

হঠাৎ মনে পড়লো কান্দাই জঙ্গলে এক তরুণের সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়েছিলো এবং শেষে সেই তাকে আটক করে নিয়ে গিয়েছিলো বনহুরের আস্তানায়।

এবার নূর বুঝতে পারলো বনহুরের অনুচর সে এবং সেই অনুচরটা তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছিলো ও টেপরেকর্ডে কথাগুলো রেকর্ড করেছিলো যা সে এখন এই দন্ডে শুনলো।

নূরের মুনে হঠাৎ সব চিন্তা ছাপিয়ে আর একটা মুখ ভেসে উঠলো। গভীর জঙ্গলে একটা তরুনী–অপূর্ব সুন্দরী, পায়ে নূপুর, দেহে জংলীমেয়ের পোশাক। ডাগর ডাগর দুটি চোখ, হরিণের মত চাহনি সে চোখে নূরের মনে মুখখানা প্রতিফলিত হলো। আনমনা হয়ে পড়লো সে, গভীর রাত তবু সে দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো।

রাত অনেক হয়েছে।

এতক্ষণ খেয়াল ছিলো না নূরের।

সময়গুলো কোন দিক দিয়ে চলে গেছে জানে না নূর। সে বার বার ভাবছিলো কে ঐ লাল কাগজখানা সহ ছোরা নিক্ষেপ করলো। কে টেপরেকর্ডে তাকে সাবধান করে দিয়ে গেছে। কে সে ব্যক্তি...

কিন্তু সব চিন্তা ছাপিয়ে ঐ একটি মুখ বারবার উঁকি দিতে লাগলো তার মনে। সব চিন্তাকে যেন ঘোলাটে করে দিচ্ছে–আজ কেন নূরের মনে এমন ভাবে নাড়া দিচ্ছে সেই তরুণী নাম ওর ফুল্লরা...

নূর বিছানায় শয়ন করেও ঘুমাতে পারলো না।

বালিশটা আঁকড়ে ধরে পড়ে রইলো চুপ চাপ, চিন্তার মিছিলগুলো একটার পর একটা চেইন। হয়ে মনের পর্দায় প্রতিফলিত হতে লাগলো।

এক সময় ভোর হয়ে এলো।

নূর শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়লো।

মুক্ত জানালা দিয়ে তাকালো দূরে। কান্দাই পর্বতের চূড়ায় ভোরের সূর্যের লালচে আলোর আভা সবে উঁকিঝুঁকি মারছে।

কান্দাই শহর এখনও জেগে ওঠেনি।

পাখিরা কলরব করছে গাছের ডালে ডালে। কান্দাই শহরে ঝামগাছের সারি বড় সুন্দর।

পাহাড়িয়া অঞ্চলে এ গাছ প্রচুর দেখা যায়। নূর মুক্ত গবাক্ষ দৃষ্টি মেলে দিয়ে ভাবছে গত রাতের কথা। ঝম গাছগুলো মাথা দুলিয়ে যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

নূর ভাবলো যা হবার হয়েছে আর যা হবার হবে। ডিটেকটিভ হবার সাধ তার মিটে গেছে। চরমভাবে পরাজিত হয়েছে নূর জীবনের প্রথম সোপানে পা রাখতেই। তার দেব সমতুল্য পিতা স্বয়ং দস্যু বনহুর... এ কথা আজও ভাবতে বা স্বীকার করে নিতে দ্বিধা হয় তার। তবু যা সত্য তা মেনে নিতে হবেই।

কিন্তু কে এই তরুণ যে তার পিছু লেগে রয়েছে।

নিশ্চয়ই ছোরার ছাপ সহ লাল কাগজখানা সেই নিক্ষেপ করেছে। টেপরেকর্ডে নিজের কণ্ঠস্বরকে বন্দী করে রেখে গেছে। নূর কণ্ঠস্বরে বুঝতে পেরেছে তার কক্ষে যে ব্যক্তি প্রবেশ করেছিলো সে তরুণ এবং দস্যু বনহুরের অনুচর। আরও বুঝতে পেরেছে সে ঐ তরুণ এক দিন তাকে আটক করে নিয়ে গিয়েছিলো আস্তানায়।

নূর তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পাল্টে নিলো তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে।

দারোয়ান চোখ রগড়ে সজাগ হয়ে সরে এলো–স্যার, বাইরে বেরুবেন?

বললো নূর–হা।

ড্রাইভার

লাগবে না। বললো নূর।

গাড়িতে উঠে বসলো সে তারপর গাড়িতে স্টার্ট দিলো।

দারোয়ান ফটক খুলে ধরলো।

নূরের গাড়ি বেরিয়ে গেলো আলগোছে।

কোথায় গেলো নূর, কেন গেলো তা কেউ জানলো না।

দারোয়ান ফটক বন্ধ করে দিলো।

একটু হাসলো দারোয়ান সাহেবের আচারণ দেখে। এত ভোরে সে কোথায় রওয়ানা দিলো কে জানে।

দারোয়ান বেশিদিনের পুরোন নয়।

সবে কয়েকদিন হলো প্রখ্যাত ডিটেকটিভ নূরুজ্জামান সাহেবের বাসায় সে চাকরী নিয়েছে। লোকটার কথাবার্তা স্বভাব–চরিত্র পছন্দ হয়েছে নূরের। তাই সে চাকরীতে বহাল করে নিয়েছে নতুন দারোয়ানটাকে।

নতুন দারোয়ানের নাম জামশেদ আলী।

আলী বলে ডাকে নূর ওকে।

নূরের গাড়ি দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই জামশেদ আলী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো নিজের অগোচরে।

*

পুলিশমহলের প্রচারিত সংবাদ অসব্যবসায়ী মহলকে বিপুল উৎফুল্ল করে তুলেছিলো তারা, স্ফীত হয়ে উঠেছিলো বনহুরের মৃত্যু সংবাদ। বিশেষ করে মিঃ হারুন প্রবীণ পুলিশপ্রধান, তিনি তো আর মিথ্যা বলবেন না। আর বলবেনই বা কেন, তিনি একজন বিশ্বস্ত পুলিশ অফিসার–কিছুতেই অসত্য বলতে পারেন না।

উচ্ছল আনন্দে আত্মহারা অসত্ব্যবসায়ী মহল নানারকম কুৎসিত কুকর্মে লিপ্ত হলো। আবার শুরু হলো নানা ধরনের মন্দ কাজ।

দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের দাপট বেড়ে গেলো কদিনের মধ্যেই।

শহরময় কেমন একটা বিশ্রি অবস্থা সৃষ্টি হলো। পুলিশমহল আবার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। নানা ধরনের আলোচনা চলতে লাগলো। যদিও পুলিশমহল দস্যু বনহুর নিহত সংবাদে আনন্দিত তবু কেমন যেন একটা অশান্তি ভাব তাদের মনে জেগে উঠলো।

চুরি ডাকাতি রাহাজানি পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। যতই বলুক পুলিশমহল দস্যু বনহুর দেশের শত্রু কিন্তু অন্তরে অন্তরে তারা জানেন দস্যু বনহুর–ঠিক শত্রু নয় তাকে মিত্র বলা যায়।

অবশ্য আইনের চোখে তারা তাকে মিত্র বলে মেনে নিতে পারেন না। তাকে পাকড়াও করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা আছে।

মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও এর দলবলকে সরকার পুরস্কৃত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু মিঃ হারুন এবং মিঃ শংকর রাও তা গ্রহণ করতে কিছুতেই সম্মত হননি। তারা জানালেন দেশ ও দশের জন্য করেছেন তাতে তারা পুরস্কার নিতে পারেন না। বনহুরকে যে নিহত করতে সক্ষম হয়েছেন এটা তারা জোর গলায় ফলাও করে বলতেও পারেন না। পুলিশ রিপোর্টে শুধু তারা লিখিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

এ ঘটনার পর থেকে মিঃ হারুন বেশ মুষড়ে পড়েছেন। তিনি এবার অবসর গ্রহণ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ভীষণভাবে।

কেউ কোনো কথা বললে উদাসীনভাবে তার সঙ্গে তিনি আলাপ করেন। সব সময় নির্জনে থাকতে চান। অফিসে খুব কম যান মিঃ হারুন। অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে বাসাতেই কাটান।

মিঃ শংকর রাও এর অবস্থাও কতকটা তাই।

এত বড় একটা মিথ্যাকে হজম করা জ্ঞানী ব্যক্তিদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তবু তারা অতি সাবধানে সামলে নিতে চেষ্টা করছেন শুধু জীবনের ভয়ে।

দস্যু বনহুর যা বলে তা সে করে।

কাজেই নিজেদের সংযত রাখা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

এবং সে কারণেই নিশ্চুপ থাকতে হয়েছে তাদেরকে।

সংবাদটা আস্তানায় পৌঁছাবার পূর্বেই জাভেদ জানতে পারে এবং সে বাপুর সন্ধান করে ফেলে। পুলিশমহলের প্রচারটা তবে কি সত্য। প্রশ্ন সে কাকে করবে, তবু পিতৃস্থানীয় রহমানকে জিজ্ঞাসা করে বসলো।

রহমান কদিন থেকে অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে পড়েছিলো। নিজের অশ্ব নিয়ে সে বেরিয়ে যায় কখন ফিরে আসে কেউ জানে না। রহমান যে কোনো এক গোপন কিছুর সন্ধানে যায় তা আর কেউ না বুঝুক বুঝতে পারে জাভেদ, সে একদিন আড়ালে আত্মগোপন করে রহমানকে ফলো করে।

রহমান কোথায় যায় এটাই লক্ষ্য করা তার কাজ।

শেষ পর্যন্ত রহমান কান্দাই জঙ্গল অতিক্রম করে শহরের অনতিদূরে এক পোড়োবাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলো।

অদূরে একটা ভগ্ন প্রাচীরের আড়ালে রহমান অশ্ব রেখে নেমে পড়লো এবং প্রবেশ করলো একটি সুড়ঙ্গে।

কেউ সহসা সেই ভগ্ন দেয়ালটাকে সুড়ঙ্গমুখ ভাবতে পারবে না। একটা গর্ত ছাড়া কিছু নয়।

রহমান নিজ অশ্বকে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রেখে যখন সে ঐ অন্ধকার গর্তটার মধ্যে প্রবেশ করলো তখন সে ভাবতেও পারেনি অন্য কেউ তাকে ফলো করছে।

পোড়োবাড়ির ভগ্ন দেয়াল সংলগ্ন গর্তটার মধ্যে যখন রহমান প্রবেশ করলো তার কয়েক মিনিট পরেই ঐ গর্তে প্রবেশ করলো জাভেদ।

নতুন এক বিস্ময়।

কিছুটা অগ্রসর হতেই দেখলো সামনে একটা দেয়াল। রহমান দাঁড়িয়ে পড়েছে দেয়ালটার পাশে। একটা পাথরের গায়ে চাপ দিলো রহমান, অমনি দেয়ালটা একপাশে সরে গেলো।

জাভেদ সুড়ঙ্গমুখটার পাশের দেয়ালে পিঠ চেপে অন্ধকারে হেলান দিয়ে লক্ষ্য করছে।

দেয়ালটা সরে যেতেই রহমান ভিতরে প্রবেশ করলো। তারপর আবার দেয়ালটা যেমন ছিলো তেমনি হয়ে গেলো।

রহমান চলে যেতেই জাভেদ প্রবেশ করলো দেয়ালের ওপাশে যেমন করে রহমান প্রবেশ করেছিলো ঠিক তেমনি করে। ওপাশে তখন অনেকদূরে এগিয়ে গেছে রহমান।

জাভেদ দেখছে রহমান চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কিছু খুঁজে ফিরছে। কিসের সন্ধান করছে রহমান? কিছু এগুচ্ছে আর নিপুণ নজরে খোঁজ করছে সে, মুখমন্ডল বড় করুণ ব্যথাপূর্ন।

রহমানের হাতে ছিলো পাওয়ারফুল টর্চলাইট সেই আলোতে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে এক অদ্ভুত আলোর সৃষ্টি হচ্ছিলো। রহমানের মুখখানা কেমন যেন বিস্ময়কর মনে হচ্ছে। পেছনে অন্ধকার সম্মুখে আলোর রশ্মি।

কিন্তু কি খুঁজে ফিরছে রহমান?

হঠাৎ এক সময় বলে উঠলো রহমান আপন মনে সর্দার শেষ পর্যন্ত আপনি এভাবে মৃত্যুবরণ করলেন যে আপনার লাশটা আমরা খুঁজে পেলাম না।

জাভেদের আর বুঝতে বাকি রইলো না রহমান কিসের সন্ধান করে ফিরছে। তার বাপুর তাহলে মৃত্যু ঘটেছে? জাভেদ যেন স্তব্ধ হয়ে যায়।

দুহাতে মাথার চুল ধরে দেয়ালে হেলান দিয়ে নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করে জাভেদ। যা শুনলো তা কি সত্য? তার বাপুর লাশ খুঁজে ফিরছে রহমান চাচা।

জাভেদ এক দন্ড আর দাঁড়াতে পারে না। সব সে সহ্য করতে পারে কিন্তু তার বাপুর মৃত্যুর কথা ভাবতে পারে না।

রহমান যখন পুনরায় এগুতে যাচ্ছিলো তখন সে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আচম্বিতে জাভেদকে দেখে রহমান ভীষণ চমকে উঠে। বিস্ময়ভরা চোখে তাকায় রহমান জাভেদের দিকে।

হাতের টর্চলাইট জ্বলছিলোই তার।

জাভেদ রহমানের কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে রহমান চাচা, যা বললে তা সত্য? বলল রহমান চাচা যা বললে তা সত্যি? বাপুর মৃত্যু ঘটেছে?

রহমানের চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এসেছিলো। যদিও রহমান জাভেদকে এখানে দেখে বিস্মিত হয়েছে তবুও বেশি ব্যথিত হলো তার কথাগুলো জাভেদ শুনে ফেলেছে বলে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো রহমান–পুলিশমহলের সংবাদে জানতে পেরেছিলাম তখন ঠিক বিশ্বাস হয়নি কিন্তু বললো রহমান।

চাচা থামলে কেন? বলল কিন্তু কি? ব্যাকুল কণ্ঠে বললো জাভেদ।

রহমান বললো–সর্দারের চিঠি আমাকে এ কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে।

বাপ চিঠি দিয়েছিলো তোমাকে

হাঁ।

কি লিখেছিলো?

চিঠিতে লেখা ছিলো সর্দার ভীষণভাবে আহত হয়েছেন, মৃত্যু তার অনিবার্য ...

রহমান চাচা।

হাঁ জাভেদ। জানি না সর্দার মৃত্যুবরণ করেছে কিনা? জানি না মৃত্যুবরণ করে থাকলে তার মৃতদেহ কোথায়?

না না, আমি বিশ্বাস করি না রহমান চাচা! বাপুকে কেউ হত্যা করতে পারবে না।

জাভেদ, যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলো তাতে কিছুই অবিশ্বাস্য নয়। সর্দারকে আহত করা হয়েছিলো।

এবং তা করেছে পুলিশমহলের কয়েকজন পুলিশপ্রধান।

এবার জাভেদ গম্ভীর হয়ে পড়ে তারপর কঠিন কণ্ঠে বলে–আমি জানি বাপুকে গ্রেপ্তার করেছিলো তরুণ টিকটিকি মিঃ নূর...এবং বাপুর মৃত্যু যদি হয়ে থাকে তার জন্য দায়ীও সে। এমনভাবে কথাগুলো শেষ করলো জাভেদ, শিউরে উঠলো রহমান।

ব্যস্তকণ্ঠে বললো রহমান–ছোট সর্দার, তুমি ভুল করছে, মিঃ নূরের দোষ নেই। সে শুধু গ্রেপ্তার করেছিলো।

জাভেদ দাতে দাঁত পিষে বলে–রহমান চাচা, মিঃ নূরের দোষ ঢাকবার চেষ্টা করছো কেন?

ভড়কে গেলো মুহূর্তের জন্য, তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো পাশাপাশি দুটো মুখ। নূর আর জাভেদ...একই পিতার সন্তান ওরা... কিন্তু ওরা কেউ কারো পরিচয় জানে না।

বললো জাভেদ–কি ভাবছো।

না না কিছু না। কিছু না ছোট সর্দার...,

জাভেদ বললো–তুমি যাই বলল রহমান চাচা, আমি মিঃ নূরকে শায়েস্তা করবোই করবো...কথাটা বলেই জাভেদ বেরিয়ে গেলো অজানা অচেনা সুড়ঙ্গে নেমে।

রহমান ছুটে গেলো সুড়ঙ্গের বাইরে।

কিন্তু ততক্ষণে জাভেদের অশ্ব চোখের আড়ালে চলে গেছে।

রহমান দাঁড়িয়ে থাকে স্তব্ধ হয়ে। তার চোখের সামনে পুনরায় ভেসে ওঠে দুটি তরুণ যুদ্ধ করছে। সেকি ভীষণ লড়াই...

*

জাভেদ যা বলছিস তা কি সত্যি?

হা আশা আম্মু, সত্যি।

বনহুর মৃত্যুবরণ করেছে?

হাঁ।

না না, এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

জাভেদ এবং আশার মধ্যে কথা হচ্ছিলো, এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো নূরী। চোখ দুটো তার লাল হয়ে উঠেছে। এতক্ষণ সে কেঁদেছে ভীষণভাবে। বনহুর

তার জীবনের চেয়েও প্রিয়, তা কে না জানে। সেই বনহুরের মৃত্যু ঘটেছে। নূরী কথাটা শোনার পর সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলো, মাটিতে লুটোপুটি করে কেঁদেছে অনেক।

নূরী স্থিরকণ্ঠে বললো–বিশ্বাস না করলেও করতে হবে বোন।

না, আমি একথা মেনে নিতে পারবো না। একটু থেমে বললো আশা–আমার দৃষ্টিশক্তি যদি এই মুহূর্তে ফিরে পেতাম তাহলে আমি ওকে মৃত্যুগুহা থেকে বের করে নিয়ে আসতাম। আমি আজ অন্ধ তাই আমাকে পঙ্গুর মত স্থির থাকতে হলো...সব শুনেও আমি এখনও জীবনে বেঁচে আছি...

নূরী বললো–আশা বোন আমি জানতাম ওর পরিণতি এমনই কারণ সে কোনোদিন জীবনের মায়া করতো না তাই কথা শেষ হয় না, ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে নূরী।

আশা হাতড়ে মূরীকে ধরে ফেলে, তারপর বলে আমি আর এখানে থাকতে চাই না বোন। জানি আমার জন্য তোমাদের অনেক কষ্ট পোহাতে হয়েছে, আর আমি তোমাদের বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। গলা ধরে আসে আশার।

নূরী বলে–বনহুরকে হারিয়ে আমি মুষড়ে পড়েছি। তুমিও আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাও? না তোমাকে যেতে দেবো না আমি।

নূরী এবং আশা যখন কথা হচ্ছিলো তখন জাভেদ বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে ছিলো একটু দূরে। তার মুখমন্ডল শুধু ব্যথাকারই নয়, একেবারে ক্লান্ত অবসন্ন মনে হচ্ছিলো তাকে। জাভেদ তার পিতার সন্ধানে বহু জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছে। পাহাড় পর্বতের গুহায় গুহায়, সমুদ্রেরই উপকূলে, শহরের নানা স্থানে–এ ছাড়া পুলিশমহল এবং গোয়েন্দা বিভাগ সব সে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। নূরের বাসস্থানে সে গিয়ে তাকে সাবধান করে দিয়েছে। কদিন তার এতটুকু বিশ্রাম হয়নি।

আজ জাভেদ না বলে পারলো না।

সে আম্মি আর আশার কাছে সব বলে নিজের মনকে হাল্কা করতে চাইলো।

কিন্তু হাল্কা হলো কই তার মন বরং আরও ব্যথাকাতর হয়ে পড়লো। আশা আর আম্মিকে সে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারছে না যেন।

রহমান এমন সময় উপস্থিত হলো সেখানে।

সবার মুখমন্ডল বিষণ্ণ দেখে সে বুঝতে পারলো ব্যাপারটা অত্যন্ত কঠিন।

সর্দারের মৃত্যু সংবাদ আস্তানায় প্রকাশ পেয়েছে।

রহমানও নিশ্চুপ ছিলো না, সেও সদাসর্বদা সর্দার কোথায় তার খোঁজে হন্তদন্ত হয়ে ঘুরে বেরিয়েছে। সন্ধান পাওয়া তো দূরের কথা, সর্দারের নামগন্ধও সে খুঁজে পায়নি। বরং নতুন একটা আশঙ্কার রেখাপাত হয়েছে তার মনে। কান্দাই পর্বতের অভ্যন্তরে একটা সুড়ঙ্গপথ ছিলো সেই সুড়ঙ্গপথ কখন যেন ধসে পড়েছে। সুড়ঙ্গপথটি ছিলো তাদের শহরের আস্তানায় যাওয়ার গোপন পথ।

রহমান যখন এই গোপন সুড়ঙ্গপথে সর্দারের সন্ধানে অগ্রসর হচ্ছিলো তখন সে দেখলো সুড়ঙ্গপথটি চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে।

বিরাট বিরাট পাথর খন্ড দ্বারা সুড়ঙ্গ মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কখন যে এমন অবস্থা হয়েছে তা বুঝতে পারে না রহমান। কিন্তু তার মনে ভীষণ একটা ভয় এবং আশঙ্কা দানা বেঁধে উঠেছে। তাহলে কি সর্দার এই সুড়ঙ্গে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছে......রহমান অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লো বহু কষ্ট করলো সে ধ্বংসস্তূপগুলো কিছু কিছু সরিয়ে ফেলার কিন্তু তার সাধ্যের অতীত এ কাজ।

এক সময় ফিরে এলো রহমান আস্তানায়।

কিন্তু কথাটা সহসা কাউকেই সে বললো না বা চিঠিখানা সে দেখালো না কোনো অনুচরকে।

রহমান কাউকে কিছু না বললেও তার মুখভাব থমথমে দেখে সবার মনে একটা সন্দেহের ছায়াপাত হয়েছিলো। কারণ রহমানকে সর্বদা কর্মব্যস্ত এবং হাস্যোজ্জ্বল দেখা যেতো।

নাসরিন সেদিন স্বামীকে বলেই বসলো–তোমার কি হয়েছে রহমান? তোমাকে যে বড় গম্ভীর লাগছে আজ কদিন হলো?

রহমান বললো–একটা দুঃসংবাদ আছে রে নাসরিন।

দুঃসংবাদ। অবাক চোখে বলেছিলো নাসরিন।

হা। হারে নাসরিন বড় দুঃসংবাদ। সর্দার হাঙ্গেরী কারাগার থেকে বেরিয়ে এলো ভূগর্ভ সুড়ঙ্গপথে কিন্তু সে আস্তানায় ফিরে এলো না।

বলো কি?

হ, বড় দুশ্চিন্তায় আছি...

কিন্তু সর্দার আসার কারণ কি?

আমি নিজেও বুঝতে পারছি না তবে সর্দার আমাকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লিখেছিলো কিন্তু চিঠিখানা কারও হাতে দিতে পারেনি। পেয়েছি সুড়ঙ্গপথের একটা তাকে...

সুড়ঙ্গপথের তাকে?

হাঁ, নাসরিন। চিঠিখানা সর্দারের হাতের লেখা হলেও তা স্বাভাবিক ছিলো না। চিঠিতে সর্দার জানিয়েছেন আমি ভীষণ আহত, মৃত্যু আমার অনিবার্য তাহলে কি সর্দার সত্যি মৃত্যুবরণ করেছে।

নাসরিন বলে উঠলো–আমি বিশ্বাস করি না এ কথা। সর্দার মরতে পারে না...

রহমান একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো–মানুষ হয়ে জন্মালে তাকে একদিন মরতেই হবে। সর্দার মানুষ, কাজেই মৃত্যুবরণ করতেই হবে তাকে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু আমরা তাকে হারাবো এ কথা কিছুতেই ভাবতে পারি না। কারণ সর্দারকে...

কথা শেষ না করে থেমে গেলো রহমান।

বললো নাসরিন–বলো থামলে কেন?

কাজ এখনও শেষ হয়নি তার, তাই তাকে.. কণ্ঠ ধরে আসে রহমানের।

নাসরিনের চোখ দুটো অশ্রু ছলছল হয়ে এসেছে। বলে নাসরিন–আমাদের দরকার ঠিক বলেছো রহমান।

রহমান বললো–সর্দারের জন্য শুধু আমরাই ব্যথাকাতর হইনি, সমস্ত কান্দাই শহরের অসহায় জনগণ মুষড়ে পড়েছে।

রহমান, সত্যি আমাদের সর্দার মৃত্যুবরণ করেছেন নাসরিন কথাটা বলতেই ঠিক সেই দন্ডে নূরী এসে দাঁড়ায় সেখানে এবং শুনে ফেলে রহমান আর নাসরিনের কথাটা।

নূরী আর্তনাদ করে উঠেছিলো ভীষণ ভাবে, মর্মবিদারক কণ্ঠে বললো–তোমরা যা বললে তা সত্যি?

রহমান এবং নাসরিন নূরীর হঠাৎ আবির্ভাবে শুধূ চমকে ওঠেনি, একেবারে থতমত খেয়ে গেছে। নূরী যে তাদের কথাবার্তা শুনে নিয়েছে তা বেশ বুঝতে পারে তারা। না বললেও নয়, বলতেই হলো সব কথা।

নূরী সব শুনে দুহাতে বুক চেপে ধরলো, কারণ বনহুর যখনই কোথাও গেছে তখন নূরীকে সে কিছু না কিছু আভাস দিয়ে গেছে, এবারও জানিয়ে গিয়েছিলো কিন্তু ফিরে আর এলো না। কেন এলো না তা জানে না নূরী।

আজ তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো।

নীরবে কাঁদলো নূরী।

কতক্ষণ কেঁদেছে সে নিজেই জানে না।

রহমান বা নাসরিন তাকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারেনি। এক সময় তারা সরে গিয়েছিলো অপরাধীর মত।

নূরী কেঁদেও মনকে হাল্কা করতে পারেনি, অস্থির মন নিয়ে সে ফিরে এসেছিলো নিজের ঘরে। এসে এখানেও সে দেখেছে আশা আর জাভেদ ঐ একই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছে, শুনতে পেয়েছে একই কথা।

নুরীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলেও সে অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে নিয়েছিলো। আশা আর জাভেদকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা তার ছিলো না।

সেদিনর পর থেকে নূরী বড় উদাসীন হয়ে পড়লো। এমন কি আশার পাশে এসেও সে বসে না বা আপন মনে নানা গল্প বলে শোনায় না।

এখন নূরী গম্ভীর হয়ে পড়েছে।

সব সময় একা একা বসে বসে ভাবে সে। সত্যিই কি তার হুর আর কোনো দিন ফিরে আসবে না? কিন্তু এর জবাব সে কোথাও খুঁজে পায় না।

আশার মনেও সেই একই প্রশ্ন।

সত্যি কি বনহুর মৃত্যুবরণ করেছে। আশা এই প্রশ্ন বুকে নিয়ে ফিরে যায় একদিন তার সেই নির্জন কুটিরে। জাভেদকে আশা নাছোড়বান্দা হয়ে ধরেছিলো, তাই জাভেদ পৌঁছে দিয়েছিলো আশার বাসস্থানে।

কিন্তু সেদিনের পর থেকে জাভেদ আরও ভয়ংকর, আরও কঠিন হয়ে উঠলো। পিতার মৃত্যু সংবাদ তাকে ভীষণভাবে অস্থির করে তুললো।

সে নিজ অশ্ব নিয়ে কান্দাইয়ের এ স্থান হতে ও স্থানে চষে ফিরতে লাগলো। জাভেদ কিছুতেই তার বাপুর মৃত্যুকে স্বীকার করে নিতে পারছিলো না, আর পারছিলো না বলেই উন্মাদ হয়ে উঠলো।

আশাও তাকে ধরে রাখতে পারলো না।

সব বাধন ছিন্ন করে বলগাহীন অশ্বের মত ছুটলো সে কান্দাইয়ের শহর বন্দর পাহাড়পর্বত সমুদ্রতীরে এমন কি ভূগর্ভের তলদেশেও সে সন্ধান করে চললো।

সেদিন জাভেদ অশ্ব নিয়ে বের হচ্ছে, এমন সময় তার কানে এলো নূপুরের ঝংকার।

অদ্ভুত সে সুর। জোছনা রাতে জঙ্গলের আধো অন্ধকারে কে এখন নৃত্য করে চলেছে।

অবশ্য আজ নতুন নয়।

আরও অনেক দিন এমনিভাবে ভেসে এসেছে তার কানে এই নূপুরের ঝংকার। এটা জাভেদকে আকৃষ্ট করেছে সে ছুটে গেছে সেই সুর লক্ষ্য করে কিন্তু

আলেয়ার মত মিশে গেছে কাউকে সে পায়নি।

আজ যখন জাভেদ তার অশ্ব নিয়ে জঙ্গল অতিক্রম করছিলো তখন সেই নূপুরের ঝংকার তার কানে আসে। হঠাৎ এ সুর তাকে স্তব্ধ করে দেয়, নেমে পড়ে জাভেদ অশ্ব থেকে।

অশ্বের লাগাম ধরে এগুতে থাকে জাভেদ।

হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে যায় সামনে।

চমকে ওঠে জাভেদ ঘন জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ে একটি জীপ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু দূরে। ভালভাবে লক্ষ্য করতেই কিছু অবাক হলো, এ যে মিঃ নূর। নূর এখানে এসেছে। চিনতে তার ভুল হয়নি তো...আরও ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখলো, হাঁ চিনতে তার ভুল হয়নি–প্রখ্যাত গোয়েন্দা মিঃ নূরুজ্জামান। এ নূরুজ্জামান তার অতি পরিচিত এবং এখন সে হাতের মুঠোয়...

জাভেদ ভুলে গেলো পিতার মৃত্যুর কথা, সে শিকারী বাঘের মত ওৎ পেতে গুটি গুটি পায়ে এগুলো।

সম্মুখে এগুচ্ছে মিঃ নূর আর পেছনে তাকে অনুসরণ করছে জাভেদ।

নূপুরের ঝংকার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

ঘন জঙ্গল।

সূর্যের আলো ঘন জঙ্গলের ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মারছে।

জাভেদ আড়ালে আত্মগোপন করে এগিয়ে চললো। অতি স্পষ্ট শুনতে পেলো এবার নূপুরের শব্দ এবং দিব্যি দেখতে পেলো আপন মনে নেচে চলেছে একটি তরুণী।

উঁচু পাথরের উপর সমতল জায়গায় নাচছে সে। চমকে উঠলো জাভেদ যে তরুণীর নূপুরের শব্দ তাকে অভিভূত করেছে, যে নূপুরের শব্দ তাকে বহুবার আনমনা করে তুলেছে, সে নূপুর তাহলে ফুল্লরার চরণের প্রতিধ্বনি।

জাভেদ প্রথমে একটু বিস্মিত হয় এবং থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

নূর কিন্তু এগিয়ে চলেছে।

তার দৃষ্টি ফুল্লরার উপর।

জাভেদ ফুল্লরাকে লক্ষ্য করলো কিছুক্ষণ, তারপর সে নূরকে অনুসরণ করতে লাগলো।

নূর তখনও এগিয়ে যাচ্ছে।

জাভেদ এবার হিংস্র হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে।

সে বুঝতে পারলো মিঃ নূর ফুল্লরাকে পাকড়াও করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে।

জাভেদ দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ঠিক বৃহৎ আকার পাথরখটার পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো।

ততক্ষণে মিঃ নূরুজ্জামান মানে নূর এসে পাথর খন্ডটার উপরে দ্রুত উঠে পড়েছে।

নূরকে দেখে ফুল্লরার চরন যুগল থেমে যায়।

বিস্ময়ভরা চোখে তাকায় ফুল্লরা নূরের দিকে। তার চোখেমুখে ফুঠে উঠে একরাশ প্রশ্ন, ভাবে ফুল্লরা এ মুখ সে ইতিপূর্বেও দেখেছে।

নূর তখন অভিভূত হয়ে পড়েছে।

এই তো তার কল্পনার রাণী.... নূর তাকে প্রথম দেখার পর হতেই যেন অভিভূত হয়ে পড়েছে, ফুল্লরা যেন একটা ফুটন্ত গোলাপ।

নূর তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ফুল্লরাকে ধরতে গেলে যেমন করে ভ্রমণ ছুটে যায় ফুলের দিকে। ভুলে গেলোনূর নিজের অস্তিত্ব। যখন ফুল্লরার হাতখানা ধরে ফেললো অমনি জাভেদ হিংস্র বাঘের মত আক্রমণ করলো নূরকে।

ফুল্লরার হাত এক ঝটকার ছাড়িয়ে দিয়ে বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরে জাভেদ নূরকে।

নূর প্রথমে একটু থমমত খেয়ে যায়, কিন্তু বেশিক্ষণ সময় লাগে না তার সামলে নিতে। সেও জাভেদকে পাল্টা আক্রমণ করলো।

শুরু হলো মল্লযুদ্ধ।

নূর পকেটে পিস্তল এনেছিলো আত্মরক্ষার জন্য। সে পিস্তল বের করার জন্য পকেটে হাত দেবার চেষ্টা করতেই জাভেদ তাকে ধরাশায়ী করে ফেললো।

নূরের গলা টিপে ধরলো জাভেদ।

নুরও কম শক্তিশালী নয়, সে ভীষণভাবে পদাঘাত করতেই জাভেদ ছিটকে গিয়ে পড়লো দুরে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো এবং পুনরায় আক্রমণ করলো নূরকে।

প্রচন্ডভাবে মুষ্ট্যাঘাত করলো জাভেদ নূরের নাকের উপর।

নূরের নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লো।

হাতের পিঠে নাকের রক্ত মুছে সোজা হয়ে দাঁড়ালো নূর। হিংস্র সিংহের মত গর্জে উঠলো তারপর সে ঝাঁপিয়ে পড়লো, টিপে ধরলো জাভেদের গলা।

জাভেদও ঠিক একই ভাবে ওর গলা বেষ্টন করে ধরে ওকে। ধরাশায়ী করার চেষ্টা করতে লাগলো।

নূর শালবৃক্ষের মত শক্ত হয়ে রইলো। সেও কৌশলে জাভেদকে ভূতলে শায়িত করার জন্য চেষ্টা করছে কিন্তু কেউ কাউকে ধরাশায়ী করতে সক্ষম হচ্ছে না।

ফুল্লরার মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

সে বুঝতে পারলে তাকে নিয়েই দুই সিংহের মধ্যে লড়াই চলেছে। বিশেষ করে জাভেদ তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছে। হঠাৎ এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হবে ভাবতে পারেনি ফুল্লরা।

ফুল্লরা ভালবাসে জাভেদকে। ছোটবেলার সাথী ফুল্লরা আর জাভেদ।

একই সঙ্গে ওরা ছোটবেলা থেকে খেলার সাথী হিসেবে গড়ে উঠেছে। বনে বনে বন্য জন্তু শিকার করা, গাছে গাছে ফল সগ্রহ করা, মাঝে মাঝে ঝরণার পানিতে সাঁতার কাটা.... বহুদিন ধরে উভয়ের মধ্যে মেলামেশা কিন্তু আজও কোনো প্রেম–প্রীতির ভাব তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। তবে ফুল্লরার মধ্যে নতুন এক ছন্দের, আবির্ভাব ঘটেছে। চঞ্চল হরিণীর মত সে উচ্ছল হয়ে উঠেছে, ফুল্লরার সবুজ মনটা জোছনা প্লাবিত রাতের মতই আলোময় হয়ে উঠেছে। জাভেদকে ফুল্লরা ভালবেসে ফেলেছে...

কিন্তু জাভেদ ঠিক আলাদা, সে আপনাতে আপনি বিভোর। নিজকে নিয়ে সে ভীষণ ব্যস্ত, এক মুহূর্ত যেন ওর ভাববার সময় নেই ফুল্লরাকে নিয়ে। তবে ফুল্লরার কিছু একটা ঘটুক তাও সে সহ্য করতে পারে না বা পারবে না। হিংস্র জন্তুর মতই সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে যখন তাদের আস্তানায় কারও উপর কোনো অন্যায় হামলা চলে।

জাভেদ ফুল্লরাকে নিয়ে পৃথকভাবে না ভাবলেও ফুল্লরা কিন্তু ওকে নিয়ে বেশ ভাবতে শুরু করেছে। ফুল্লরার মনের আকাশে ঐ একটিমাত্র পুরুষ যাকে সে অন্তর দিয়ে পেতে চায়।

কিন্তু জাভেদকে ফুল্লরা কিছুতেই আকৃষ্ট করতে পারেনি। যতই ফুল্লরা জাভেদকে কাছে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে ততই সে দূরে সরে গেছে।

মাঝে মাঝে অভিমানে ভরে উঠেছে ফুল্লরার মন।

সে নীরব হয়ে গেছে।

আড়ালে বসে চোখের পানি মুছেছে।

কিন্তু কোনো ফল হয়নি।

জাভেদ কোনো সময় তাকে নিয়ে ভাবেনি।

এমনি করে ফুল্লরার দিনের পর দিন কেটেছে, জাভেদকে দেখলে রাগে অভিমানে গম্ভীর মুখমন্ডলে সরে গেছে ওর কাছ থেকে। ভেবেছে ফুল্লরা ও নিশ্চয়ই তাকে ডেকে কথা বলবে কিন্তু সে আশা তার ব্যর্থ হয়েছে।

জাভেদ কোনো সময় খেয়ালই করেনি, ফুল্লরা তার প্রতি বিরূপ হয়েছে।

ফুল্লরা যখন হতাশ হয়ে পড়েছে তখন সে বেছে নিয়েছে এক পথ। জাভেদকে ফুল্লরা আকৃষ্ট করবে তার নাচ দিয়ে। তাই সে সুযোগ পেলেই পর্বত অঞ্চলে কোনো এক নিভৃত স্থানে আপন মনে নেচে চলে।

যখন জাভেদ ফুল্লরার নূপুরের ঝংকারে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে যায় তখন ফুল্লরা লুকিয়ে পড়ে এবং আড়ালে আত্মগোপন করে লক্ষ্য করে জাভেদকে।

ফুল্লরা চায় নতুনভাবে জাভেদের মনে নিজকে প্রতিষ্ঠা করতে। সে জানে তার নূপুরের ঝংকার একদিন না একদিন জাভেদকে পতঙ্গের মত টেনে আনবে তার পাশে।

আজ ফুল্লরা যখন আপন মনে কান্দাই জঙ্গলের নিভৃত এক জায়গায় নেচে চলেছিলো তখন আচম্বিতে ঘটলো এক বিভ্রাট। হঠাৎ নূর এসে পড়ায় বিব্রত হয়ে পড়লো ফুল্লরা, থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো সে নাচ বন্ধ করে।

বিস্ময় কাটবার পূর্বেই জাভেদ অকস্মাৎ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ করে নূরকে।

ফুল্লরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেও মণে প্রানে কামনা করছিলো জাভেদের আগমন, বুকটা ওর আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো। কত যে খুশি লাগছে তা ফুল্লরার চোখমুখ লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারতো কিন্তু এ মুহূর্তে কেইবা তা লক্ষ্য করবে।

জাভেদ আর নূর যুদ্ধ চলেছে।

যেন দুটি সিংহের লড়াই।

কেউ কাউকে পরাজিত করতে পারছে না।

ফুল্লরার দুচোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

অদ্ভুত এক দৃশ্য।

হঠাৎ এই মুহূর্তে অশ্বপদ শব্দ শোনা যায়।

দূরে বেশ দূরে অশ্বপদ শব্দ হচ্ছে।

জাভেদ বা নূর এ শব্দ শুনতে পায় না, কারন তখন তারা হিংস্র জন্তুর মত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলো। তাদের খেয়ালই ছিলো না অন্য কোনো দিকে, শুধু সামনে শত্রুকে পরাজিত করাই যেন তাদের উভয়ের লক্ষ্য।

অশ্বপদ শব্দ শুনতে পেলো ফুল্লরা।

সে কান পেতে বুঝতে পারলো এ অশ্বপদ শব্দ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসছে এদিকে, কিন্তু কে সে এ পথে আসতে পারে।

ফুল্লরা প্রতীক্ষা করছে অশ্বারোহীর।

পাথুরে মাটিতে অশ্বপদ শব্দ আরও স্পষ্ট শোনা যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অশ্বারোহী এসে হাজির হলো সেখানে।

অবাক হলো ফুল্লরা, এ যে কায়েস।

কায়েস অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দ্রুত এগিয়ে যায় সেই পাথরখন্ডটার উপরে এবং সে উভয় যোদ্ধার মাঝামাঝি এসে দাঁড়ায়–থামো।

কায়েসের দেহেও কম শক্তি ছিলো না। সেও একজন বিখ্যাত দস্যু। চেহারাও দোহারা লম্বা মাথায় ঝাকড়া চুল। চোখ দুটো বেশ বড় এবং লাল। বাহুর মাংসপেশীগুলো ফুলে আছে শক্ত পাথরের মত।

কায়েস এসে মাঝামাঝি দাঁড়ালো।

নূরকে কায়েস চিনলেও ভাবে সে না চেনার ভান করে লড়াই মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করলো।

কায়েসকে দেখে জাভেদ কিছুটা শান্ত হলো। তবু রাগে গ গ করতে লাগলো সে। নূরও কম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেনি, সেও নিজকে সংযত করে নিয়ে সরে দাঁড়ালো।

কায়েস নূরকে লক্ষ্য করে বললো–আমরা জংলী মানুষ, বাবুজী আপনি কেন আমাদের মধ্যে এসেছেন। এখানে শুধু জংগল আর জংগল

আর তোমাদের মত অমানুষ। বললো নূর।

জাভেদ দাঁতে দাঁত পিষে বললো–হাঁ, আমরা অমানুষ, হিংস্র জন্তুর চেয়েও ভয়ংকর। মনে রেখো এরপর যদি তোমাকে এ জঙ্গলে দেখি তাহলে মৃত্যু তোমার অবধারিত।

নূর কঠিন কণ্ঠে বললো–তোমার সাধ্য নেই আমার তুমি ক্ষতি করতে পারো। আমি এখানে আসবোই....

জাভেদ মুষ্ঠিবদ্ধ হাত নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলো নূরের দিকে কিন্তু কায়েস বাধা দিলো তাকে এবং রাগতভাবে বললো–তোমরা উভয়ে নিজ নিজ কাজে চলে যাও, আমি ফুল্লরাকে নিয়ে যাচ্ছি।

ফুল্লরা। নূর মনে মনে নামটা স্মরণ করলো কয়েকবার। এ নামটা সে পূর্বে শুনেছিলো তবে ভালভাবে খেয়াল ছিলো না।

জাভেদ কায়েসের কথা অমান্য করতে পারলো না, সে একবার নূর ও কায়েসের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দৃঢ় পদক্ষেপে চলে গেলো।

অদূরে তার অশ্ব অপেক্ষা করছিলো।

জাভেদ নিজ অশ্বে চেপে বসলো।

জাভেদের অশ্ব তাজের চেয়ে ভয়ংকর। চেহারাটা কেমন যেন রুক্ষ, চকলেট কালারের রংটা আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে।

তাজের মত কেশর নেই জাভেদের অশ্বের।

তবে একেবারে কেশশূন্য নয়, প্রায় চার আংগুল লম্বা কেশর রয়েছে, তা সজারুর কাটার মত খাড়া। দেখলে শরীর শিউরে ওঠে।

জাভেদ তার অশ্বপৃষ্ঠ চেপে বসার সঙ্গে সঙ্গে সামনের পা দুখানা তুলে চিহি চিহি শব্দ করে উঠলো–তারপর উল্কাবেগে ছুটলো গন্তব্যপথের উদ্দেশ্যে।

কায়েস একদৃষ্টে তাকিয়েছিলো জাভেদের দিকে। কি ভাবছিলো সেই জানে।

সম্বিৎ ফিরে এলো কায়েসের, ফিরে তাকাতেই কায়েস দেখলো নূর চলে গেছে সেখান থেকে। শুধু স্তব্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফুল্লরা। সেও তাকিয়ে আছে জাভেদের চলে যাওয়া পথের দিকে।

কায়েস নূরকে ফেরাবার চেষ্টা করলো না। একটু হেসে বললো সে ফুল্লরাকে– চলো মা, ফিরে চলো।

ফুল্লরার মনে আজ অনাবিল আনন্দ।

জাভেদ এসেছিলো তাকে উদ্ধার করতে।

সত্যি তাহলে জাভেদ তাকে ভালবাসে, না হলে সে এমনভাবে আসতো না। ফুল্লরার মন উচ্ছল আনন্দে ভরে ওঠে....

কায়েসের কথা তার কানে যায় না, সে আপন মনে মৃদু মৃদু হাসছিলো।

কায়েস বুঝতে পারে, সেও হাসে–তারপর বলে–চলো ফুল্লরা, আস্তানায় যাই।

এতক্ষণে যেন হুশ হলো ফুল্লরার।

বললো–চলো কায়েস চাচা, চলো।

কায়েস আর ফুল্লরা পাথরখন্ডটার উপর থেকে নামতে নামতে নূরকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো ফুল্লরা–ওকে আমি ক্ষমা করবো না কায়েস চাচা। একবার নয়, আরও কয়েকবার ও আমার উপর...

হেসে বললো কায়েস–ওকে তুমি ভুল বুঝছো মা। ও কিন্তু খুব ভাল ছেলে ...

তুমি ওকে চেনো কায়েস চাচা?

না না, চিনি না, আর আমি ওকে চিনবো কি করে? কায়েস হঠাৎ কথাটা বলে বেকুফ বনে গেছে যেন। তাই সে কথাটাকে তুলিয়ে দেবার চেষ্টা করলো।

কিন্তু ফুল্লরা চালাক মেয়ে, সে ভীষণভাবে ধরে বসলো–কে ঐ তরুণ যাকে তুমি নিশ্চয়ই চেনো?

না, আমি চিনি না তবে সে জাভেদের হাতে ধরা পড়ে আস্তানায় বন্দী হয়েছিলো। সর্দার ওকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ছেলেটা মন্দ বলে মনে হয় না। তবে সে ডিটেকটিভ তাই তার অপরাধ

ঐ পুঁচকে ছোঁড়াটা ডিটেকটিভ।

হাঁ।

বলো কি কায়েস চাচা?

হাঁ, ও ডিটেকটিভ এবং এই তরুণই আমাদের সর্দারকে গ্রেপ্তার করেছিলো এবং তাকে হাঙ্গেরী কারাগারে আটক করেছিলো।

বল কি।

হাঁ, ঠিক বলছি।

তাহলে তাকে অমনভাবে ছেড়ে দিলে কায়েস চাচা।

যাকে নিয়ে কথা হচ্ছিলো কায়েস আর ফুল্লরার মধ্যে সে ততক্ষণে গাড়ি নিয়ে চলে গেছে। দৃষ্টির আড়ালে। শুধু একরাশ ধুলো ছড়িয়ে আছে স্থানটার চারপাশে।

নূর গাড়ি নিয়ে ফিরে চললেও মন তার পড়ে রইলো কান্দাই জঙ্গলে। ফুল্লরা জংলী মেয়ে, বুনো গোলাপের মতই সে সুন্দর কিন্তু সে নাগিনীর মতই হিংস্র। নূর জেদী ছেলে, সে শপথ করেছে ফুল্লরাকে সে আপন করে নেবেই। ওকে ওর ভীষণ ভাল লেগেছে।

ফুল্লরা নদীর নাম। কাকচক্ষুর মত সচ্ছ তার পানি। কুলকুল ধারায় সদা বয়ে চলেছে ফুল্লরা আপন মনে। তেমনি এ ফুল্লরারও আপনাতে আপনি বিভোর। নাচে গায়, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়, তীরধনু নিয়ে পাখি শিকার করে, কখনও কখনও ঝরণার পানিতে সাঁতার কাটে।

ফুল্লরার প্রতিচ্ছবি নূরের মনে দাগ কেটেছে।

শত কাজের ফাঁকেও ফুল্লরাকে ভুলতে পারেনি নূর। জীবনে সে বহু মেয়েকে দেখেছে তবে কারও সঙ্গে মিশবার মত তার মনোবৃত্তি হয়নি, কারণ একটা

মেয়েও তার হৃদয় আকর্ষণ করেনি। অতি আধুনিকা তরুণী সে পছন্দ করে না, বরং নূর এসব মেয়েদের করুণা করে। মনে করে এরা বড় অসহায়! নিজস্ব যৌবন এদের অতৃপ্ত রেখেছে, তাই এরা প্রসাধনীর প্রলেপে এবং বিকৃত পরিচ্ছদে অপর ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজকে আকর্ষণীয় হিসেবে প্রতিফলিত করতে চায়। নূর ফুল্লরার মধ্যে দেখেছে অতুলনীয় এক সৌন্দর্য যা প্রসাধনীর প্রলেপে বিকৃত হয়নি।

নূর আপন মনে গাড়ি চালিয়ে চলেছে।

কতকগুলো কথা এলোপাতাড়ি তার মনে পড়ছিলো। হঠাৎ পথ রোধ করে দাঁড়ায় জাভেদ তার অশ্ব নিয়ে।

নুর গাড়ি নিয়ে দ্রুত পাশ কেটে চলে যায়। ভীষণ বেগে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দেওয়ায় জাভেদ অশ্ব নিয়েও কিছুটা পিছিয়ে পড়ে।

অতি কৌশলে নূর গাড়ি চালিয়ে চললো।

বিস্ময়কর তার ড্রাইভিং কৌশল।

জাভেদ তার অশ্ব নিয়ে ছুটলো কিন্তু গাড়িখানাকে সে পাকড়াও করতে পারলো না।

ততক্ষণে গাড়ি নিয়ে নূর বড় রাস্তায় উঠে পড়েছে।

এবার তাকে পাকড়াও করা বড় মুস্কিল।

দস্যু বনহুরের সন্তান নূর, ঠিক তারই মত তার কার্যকলাপ। তেমনি শক্তিশালী এবং বুদ্ধিদীপ্ত।

নুর কৌশলে গাড়ি চালিয়ে জাভেদের অশ্বকে পরিহার করার চেষ্টা করতে লাগলো।

জাভেদও অশ্বচালনায় কম দক্ষ নয়, সেও নূরের গাড়িখানাকে পাকড়াও করবার জন্য জীবনপণ করে ছুটলো। কিন্তু বেশিক্ষণ এভাবে উভয়ে অগ্রসর হতে

পারলো না। জাভেদ নূরের গাড়ির পথরোধ করে গাড়িখানাকে আটক করে ফেললো।

নূর গাড়ি থেকে নামতেই জাভেদ তার অশ্ব থেকে লাফিয়ে নেমে নূরের জামার কলার চেপে ধরলো, দাঁতে দাঁত পিষে বললো–গোয়েন্দা নূর, তুমি আমার যে ক্ষতি করেছে তা পূর্ণ হবে না কোনোদিন। কথা শেষ না করেই প্রচন্ড এক ঘুষি বসয়ে দিলো সে নূরের নাকের উপর।

সঙ্গে সঙ্গে নূরের নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে এলো।

নূর জাপটে ধরতে গেলে জাভেদকে কিন্তু জাভেদ তার পূর্বেই আর একটা মুষ্ট্যাঘাত নূরকে আচমকা করে বসলো।

নূর সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেলো নিচে পাথরের উপরে।

জাভেদ ওর বুকে একখানা পা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো তারপর অপর পা খানা দিয়ে নূরের গলায় চাপ দিলে ভীষণভাবে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে এক বৃদ্ধ জটাজুটধারী সন্ন্যাসী এসে বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরলো জাভেদের দক্ষিণ হাতখানা, তারপর এক ঝটকায় টেনে নামিয়ে নিলো, বললো–তাকে এভাবে হত্যা করার চেষ্টা করছো কেন?

ও আমার সর্দারকে বন্দী করেছিলো এবং তাকে হত্যা করেছে, তাই আমি….

না, ও হত্যা করেনি, তুমি মিছামিছি ওর প্রতি অন্যায় আচরণ করছে। যাও, তোমার কাজে তুমি চলে যাও।

জাভেদের কঠিন মন নরম হলো, তার মা নূরীর কথা মনে পড়লো। একদিন সে বলেছিলো বাবা জাভেদ কোনোদিন কোনো সন্ন্যাসী অথবা আউলিয়াকে দেখলে তাকে সম্মান করবে এবং তিনি যা বলবেন তা শুনবে। ….মায়ের কণ্ঠের প্রতিধ্বনি হলো তার কানের কাছে। জাভেদ নূরের গলার উপর থেকে পা খানা নামিয়ে নিলো।

নূর তখন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে।

জাভেদ একবার সন্ন্যাসীর মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো নূরের দিকে, তারপর অশ্বের দিকে এগিয়ে গেলো।

জাভেদ দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই সন্ন্যাসী নূরকে তুলে নিলো কাঁধে, তারপর গাড়িতে তুলে শুইয়ে দিলো পেছন আসনে।

*

নূর চোখ মেলে তাকাতেই বাবুর্চি ভয়বিহ্বল কণ্ঠে বলে–মালিক, আপনার এমন অবস্থা হল কি করে?

নূর কিছুই স্মরণ করতে পারছে না, সে আবার চোখ বন্ধ করলো।

বাবুর্চি প্রায় কাদো কাঁদো কণ্ঠে বললো–গরম দুধ আনবো?

নূর কোনো জবাব দিলো না।

বাবুর্চি ব্যাকুল কণ্ঠে বললো আবার–মালিক। মালিক।

নূর চোখ বুজে স্মরণ করতে চেষ্টা করছে। ধীরে ধীরে মনে পড়ছে সব কথা কান্দাই জঙ্গল, তার আকাঙ্ক্ষিত বণ্য তরুণী, অচেনা জংলী যুবক, মল্লযুদ্ধ, হঠাৎ এক ব্যক্তির আবির্ভাব, লোকটার দেহে জমকালো পোশাক, লোকটা নিশ্চয়ই তরুণীর কোনো আত্মীয় হবে কিন্তু হঠাৎ সে হাজির হলো কি করে ভাবছে নানা কথা, তারপর সে এখানে এলেই বা কি করে? জংলী যুবকটা তাকে আচমকা আক্রমণ করে বসলো, হঠাৎ আক্রমণে কিছুটা চমকে গিয়েছিলো নূর, কৌশলে তাকে কাবু করেছিলো জংলী যুবকটা....সব খেয়াল হচ্ছে কিন্তু নূর এখানে এলো কি করে? এ যে একেবারে ভৌতিক ব্যাপার।

মালিককে চুপ করে থাকতে দেখে বললো বাবুর্চি–মালিক, পুলিশ অফিসে ফোন করবো?

নূর এবার শয্যায় উঠে বসে বললো–পুলিশ অফিসে ফোন করবে কেন?

মালিক আপনার জন্য ...

তার মানে?

মালিক আপনার এ অবস্থা, আর আমি চুপ করে থাকবোর যাই পুলিশ অফিসে ফোন করে দেই....

না থাক, পুলিশ অফিসে ফোন করতে হবে না।

মালিক এত বড় ঘটনা...

কি বলছো হোসেন, আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

মালিক আপনাকে এত রাত্রে এই অবস্থায় নিয়ে এলো....

হোসেন বসো। আমিই জানতে চাই আমাকে কে এখানে নিয়ে এলো আর কেমনভাবেই বা এলাম?

মালিক আপনি....

বলো থামলে কেন?

মালিক আপনাকে অচেতন অবস্থায় একজন জোয়ান লোক কাঁধে করে রেখে গেলো।

জোয়ান লোক।

হাঁ

কেমন দেখতে।

কোনো শ্রমিক হবে। গায়ে কালি মাখা জামা কাপড় তার দেহের স্থানে স্থানে কালি লেগে ছিলো কিন্তু ভীষণ শক্তি ছিলো ওর দেহে। বয়স জোয়ান তবে একেবারে কম নয় মালিক।

সে আমাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এসেছে?

মালিক, লোকটা বললো আপনি নাকি কোনো জঙ্গলের ধারে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন মাথায়–নাকে রক্তমাখা ছিলো। লোকটা ঐ পথে যাচ্ছিলো তখন সে আপনাকে দেখতে পায়....

তারপর?

সে প্রথমে আপনাকে মৃত মনে করে, পরে বুকে কান লাগিয়ে পরীক্ষা করে জীবিত বলে জানতে পারে। তখন সে

ঐ স্থান থেকে সে আমাকে কাঁধে করে বয়ে এনেছে।

না মালিক, লোকটা গাড়ি চালাতে জানে, তাই সে গাড়িতে তুলে নিজে ড্রাইভ করে এনেছে।

আমার ঠিকানা সে পেলে কি করে?

মালিক, আমিও কম লোক নই, সব তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

আর সে তোমাকে সব কথার উত্তর দিলো?

দেবেনা আমাকে। মালিক আমি ওকে আটক করে ফেলেছিলাম, বলেছিলাম তুমি একে এবং মালিককে কোথায় পেলে আর তাকে কি করে এখানে আনলে, ঠিকানাই বা পেলে কোথায়। মালিক, লোকটা আমার প্রশ্ন শুনে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলো, তারপর আমি যখন পুলিশে ফোন করবো বলে ভয় দেখালাম তখন সব বললো। না বলে কি ওর উপায় ছিলো, আমি ওকে আটক করে ফেলতাম।

কেমন করে আটক করতে?

আমার বুদ্ধি আছে মালিক, আমি বাহির থেকে ঘরের ছিটকানি আটকিয়ে আটক করে ফেলতাম।

সাবাস হোসেন, যা হোক তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না।

মালিক, আপনার অবস্থা দেখে আমার মাথায় বুদ্ধি কিলবিল করে উঠেছিলো। যা জিজ্ঞাসা করেছি তারই জবাব সে দিয়েছে। সত্যি মালিক, লোকটা বড় ভাল মানুষ। যেমন কথা তেমনি তার দোহারা চেহারা…

সে নিজে ড্রাইভ করে আমার গাড়িসহ আমাকে এনেছে?

কি করে আমার ঠিকানা সে পেলো?

আপনার পকেটে নাকি কার্ড পেয়েছিলো।

বললো নূর–তাহলে সে তোমাকে সবকথা খুটিয়ে খুটিয়ে বলেছে।

হাঁ মালিক।

তারপর সে কত রাতে আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়েছে। দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে কথাটা জিজ্ঞাসা করলো নূর।

হোসেন মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বললো–বেশিক্ষণ হয়নি মালিক। লোকটা আপনাকে পৌঁছে দিয়ে এই একটু পূর্বে চলে গেছে

একটু পূর্বে

আপনার জ্ঞান ফিরে আসার পর পরই সে চলে গেছে মালিক।

তাহলে তো সে বেশিদূর যায়নি।

খুঁজে আসবো?

যাও।

হোসেন বাবুর্চি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

নূর ডাকলো–শোনো।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বাবুর্চি।

যাও দুধ নিয়ে এসো।

মালিক, তাকে খুঁজে আনবো না?

পাবে না।

কেন পাবো না।

সে কি আর বসে আছে। চলে গেছে তোমার সীমানার বাইরে।

মালিক।

যাও দুধ নিয়ে এসো, বড় পিপাসা পেয়েছে, পানিও নিয়ে এসো।

চলে যায় বাবুর্চি।

একটু পরে ট্রের উপরে এক গেলাস গরম দুধ আর এক গেলাস পানি নিয়ে হাজির হলো হোসেন।

নূর বিনাবাক্য ব্যয়ে প্রথমে দুধ পান করে পরে পানি পান করে নিলো।

হোসেন বললো–মালিক, আপনার জামাকাপড়ে রক্ত লেগে আছে। নাকে এবং কপালেও রক্ত, ডাক্তার ডাকবো?

যাও তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না হোসেন। তুমি ঘুমাওগে।

কিন্তু আপনি?

আমিও ঘুমাবো।

হোসেন এরপর আর কোনো কথা বলতে পারে না। সে খালি গেলাস সহ ট্রে নিয়ে চলে যায়।

হোসেন চলে যেতেই নূর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। এখন কোনোরকম অসুস্থতা উপলব্ধি করছে না সে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায়, নিজের চেহারা লক্ষ্য করে সে ভালভাবে কপালের একপাশে কিছুটা রক্তের ছাপ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। চুলগুলোও রক্তে চাপ চাপ হয়ে আছে। পাথরে মাথাটা ঠুকে যাওয়ায় সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সংজ্ঞা হারানোর পর কে তাকে নিয়ে এলো এখানে? হোসেনের মুখে সে জানতে পারলো অনেক কিছু। কিন্তু কে সে যে তাকে কাঁধে করে বয়ে এনেছে তার শক্তিও কম নয়, তারপর সেই ব্যক্তি ড্রাইভ জানে। শুধু ড্রাইভ নয়, শিক্ষিতও বটে....তার জামার পকেট থেকে নেমকার্ড বের করে পড়ে নিয়েছে–আপন মনে একটা শব্দ উচ্চারণ করলো–হুঁ।

ড্রেসিং টেবিলটার পাশ থেকে বিদায় নিয়ে নূর বাথরুমে প্রবেশ করে।

*

ফুল্লরা সেদিনের পর থেকে বড় হাস্যোজ্জ্বল হয়ে পড়েছে। তার মন যাকে চায় সেই জাভেদ তাকে ভালবাসে। এটা তার সবচেয়ে বড় আনন্দ। শুধু আনন্দ নয়–এ যে তার অন্তরের অনুভূতি সুখময় স্মৃতি। হাসি গানে ভরে উঠে ফুল্লরার জীবন।

কিন্তু সে ঐ দিনের পর থেকে জাভেদের সাক্ষাৎ পায়নি। কোথায় থাকে জাভেদ, কখন সে আস্তানায় ফিরে তাও সে টের পায় না।

জাভেদকে সে সন্ধান করে ফেরে।

সেদিন ফুল্লরা গাছের ডালপাতার দোলনা বানিয়ে দোল খাচ্ছিলো, এমন সময় অশ্বপদশব্দ শুনতে পায়।

ফলুরার বুকটা টিপ টিপ্ করে উঠলো।

সে বুঝতে পারলো জাভেদের অশ্বের খুরের শব্দ এটা।

খুশিতে ভরে উঠলো ফুল্লরার মন।

উচ্ছল আনন্দে নাচতে ইচ্ছা হলো কিন্তু নিজকে সংযত করে নিলো ফুল্লরা, দাঁড়িয়ে রইলো বুকভরা আশা নিয়ে।

জাভেদ এসে পড়লো অল্পক্ষণেই।

ফুল্লরা বন পথের ধারে দাঁড়িয়ে রইলো।

জাভেদ তাকে দেখে নিশ্চয়ই অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে তাকে সাদর অভিনন্দন জানাবে। তাকে তুলে নেবে অশ্বপৃষ্ঠে। একটু পরে জাভেদের অশ্ব দৃষ্টিগোচর হলো।

উল্লাসে আঁচল উড়াতে লাগলো ফুল্লরা।

এগিয়ে আসছে জাভেদের অশ্ব।

কিন্তু একি, জাভেদের অশ্ব তার পাশ কেটে চলে গেলো। একটিবার জাভেদ তার দিকে ফিরে তাকিয়েও দেখলো না।

জাভেদ অশ্ব নিয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই ফুল্লরার মুখমন্ডল বিষণ্ণ হয়ে পড়লো, দুচোখ ছাপিয়ে পানি এলো ওর। দাঁত দিয়ে হাতের পিঠে কামড়ে প্রায় রক্ত বের করে ফেললো। অভিমানে পায়ের বুড়োআংগুলে মাটি খুঁড়তে লাগলো সে।

সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা সব যেন নিমিশে মিলে গেলো। স্নান ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো ফুল্লরার মুখমন্ডল।

রাগে–অভিমানে ভরে উঠলো তার মন।

জাভেদ তাকে দেখেও না দেখার ভান করলো। একটি বার তার দিকে তাকিয়ে দেখলো না বা তাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিলো না।

ফুল্লুরা মাটিতে বসে কাঁদতে থাকে ছোট্ট বাচ্চার মত। তবে কেন সে ঐ দিন তাকে বাঁচাতে গিয়েছিলো সেই তরুণের হাত থেকে। তবে কেন সে এত দরদ দেখাতে গেলো। যদি সে তাকে ভালই না বাসবে তাহলে–আর ভাবতে পারে না ফুল্লরা, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

ফুল্লরার মনে পড়ে আরও বহুদিনের কথা।

সব যেন আজ একের পর এক মনে পড়তে থাকে। জাভেদ তার ছোটবেলার সাথী অথচ আজও ফুল্লরা তার মন বুঝতে পারলো না।

ফুল্লরার চোখের পানিতে বুক ভেসে গেলো।

বড় দুঃখ পেয়েছে আজ ফুল্লরা।

বেলা কখন গড়িয়ে যায়, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে কান্দাই জঙ্গলের বুকে। ফুল্লরা উঠে দাঁড়ায়।

পরদিন সকালে জাভেদ বাইরে বের হবার জন্য তার অশ্বের পাশে এসে দাঁড়াতেই ফুল্লরা এসে দাঁড়ালো, দুচোখ তার কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে গেছে।

অভিমানে ঢলঢল মুখমন্ডল, গন্ডদ্বয় রক্তাভ। ধরাগলায় বললো ফুল্লরা–কোথায় যাচ্ছিসরে জাভেদ

ঝাম জঙ্গলে।

আশার কাছে যাবি তুই?

হাঁ।

আমাকে নিয়ে যাবি?

না, হবে না।

কেন হবে না রে?

বললাম হবে না।

জাভেদ, আমাকে নিয়ে চল্ আমিও যাব তোর সঙ্গে।

বললাম হবে না। কথাটা বলেই জাভেদ উঠে পড়লো তার অশ্বপৃষ্ঠে।

ফুল্লরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

জাভেদ একরাশ ধূলো উড়িয়ে চলে গেলো ম জঙ্গল অভিমুখে।

একদিন এক রাত্রি পর জাভেদ পৌঁছলো ঝাম জঙ্গলে। আশা অশ্বখুরের শব্দ শুনে সজাগ হয়ে উঠেছিলো, বেরিয়ে এলো সে তার কুটির থেকে।

কুটির থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো আশা কুটিরের বারান্দায়। বুকভরা তার আনন্দ, জাভেদের অশ্বপদশব্দ আশা চেনে, তাই এত খুশি লাগছে আশার।

জাভেদ অশ্ব নিয়ে আশার উঠানে এসে দাঁড়ালো। আশাকে দেখে জাভেদেরও কম আনন্দ লাগছে না। সে দ্রুত অশ্ব থেকে নেমে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো আশাকে, শূন্যে তুলে ধরে বললো–আশা আম্মু। তুমি ভাল আছো?

আশা হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো–জাভেদ, বাপু আমার, তুমি কেমন আছো?

তুমি কেমন আছো তা তো বললে না আশা আম্মু

তুই না থাকলে আমি কি ভাল থাকতে পারি বাপ। বড় দুঃখ, তুই আমার কাছে নেই।

তোমার বুঝি খুব কষ্ট হচ্ছে?

না রে, কষ্ট হচ্ছে না। মুনিয়া আছে, সে আমাকে রোজ ফল দিয়ে যায়।

মুনিয়া সে আবার কে? বললো জাভেদ।

এক গরীব কাঠুরিয়ার এক মাত্র ছেলে। জাভেদ ও বড় ভাল ছেলে, আমাকে ফল এনে দেয়। আমাকে রান্না করে দেয়, ওর মা এসে আমাকে স্নান করিয়ে দিয়ে যায়। ওরা এ জঙ্গলেই থাকে।

যাক বাঁচালে আশা আম্মু। তোমাকে নিয়ে আমার যত চিন্তা।

কেন রে, আমাকে নিয়ে তোর এত চিন্তা কেন?

তোমার দৃষ্টিশক্তি নেই বলে।

ও আমি অন্ধ হয়ে গেছি, তাই তোর এত ভাবনা চিন্তা আমাকে নিয়ে।

তাই আশা আম্মু।

ঐ সময় এক ভীল যুবক গামছার আঁচলে কিছু ফল নিয়ে হাজির হলো সেখানে।

পদশব্দে আশা বলে উঠলো–ঐ তো মুনি এসেছে।

জাভেদ তাকিয়ে দেখলো একটি তরুণ গামছার আঁচলে কিছু ফল বেঁধে নিয়ে হাজির হয়েছে, মাথায় কাঠের বোঝা।

কাঠের বোঝাটা উঠানের একপাশে নামিয়ে রেখে এগিয়ে আসতে গিয়ে জাভেদকে দেখে থমকে দাঁড়ায়।

জাভেদ বুঝতে পারে মুনিয়া তাকে দেখে ভয় বা সঙ্কোচ বোধ করছে। তাই সে হাতের ইংগিতে ডাকলো কাছে।

মুনিয়া দ্বিধাভরা পদক্ষেপে এগিয়ে আসে।

জাভেদ ওর কোমর থেকে ফলগুলো তুলে নিয়ে আশার হাতে দেয়, তারপর বলে–মুনিয়া, তোকে দেখে আমি খুব খুশি হলাম। আশা আম্মুর কাছে সব শুনেছি, খুব ভাল ছেলে তুই। পিঠ চাপড়ে দেয় জাভেদ ওর।

আশা আর জাভেদকে ফুল দিয়ে মুনিয়া কাঠের বোঝা তুলে নেয় কাঁধে, তারপর চলে যায়।

জাভেদ বলে–আশা আম্মু, ভাগ্যিস ও ছিলো তাই তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

তা ঠিক, মুনিয়া না থাকলে বিপদ হতো। একটু থেমে বললো আশা–জাভেদ, অনেক দিন থেকে ভাবছি একটা কথা তোমাকে বলবো–কিন্তু বলি বলি করেও বলা হয়নি।

বলো যদি কোনো আপত্তি না থাকে?

আশা বললো–আমি অন্ধ হয়ে গেছি, তাই পথ চিনবো না। জাভেদ, কুঠিরের দক্ষিণ কোনে একটা সিন্দুক আছে দেখছো?

দেখছি। ও সিন্দুকে নাকি তোমার সোনাদানা মনিমুক্তার অলঙ্কার রয়েছে বলেছিলে?

না, সোনাদানা মনিমুক্তার অলঙ্কার নেই, আছে একটা সুড়ঙ্গপথ।

আশা আম্মু!

হাঁ, সত্যি বলছি। এসো আমার সঙ্গে। আশা জাভেদের হাত ধরে কুটিরের মধ্যে নিয়ে যায়। সিন্দুকের পাশে এসে দাঁড়ালো আশা। বললো সে–ঐ বামপাশের দেয়ালে একটা ছবি আছে দেখছো?

হাঁ, দেখছি ছবিটা এক নর্তকীর।

নর্তকী অন্য কেউ নয়–আমি।

আশা আম্মু, তুমি নর্তকী ছিলে?

ছিলাম কিন্তু

বলো থামলে কেন?

তুমি আমাকে ঘৃণা করো না, সে এক কাহিনী তোমাকে একদিন বলবো আমার জীবন নিয়ে। হাঁ ঐ ছবির পেছনে আছে একটা চাবি, নিয়ে এসো।

জাভেদ আশার আদেশ পালন করলো।

ছবিখানা সরিয়ে নিতেই বেরিয়ে পড়লো একটা অদ্ভুত চাবি। জাভেদ চাবিখানা এনে হাতে দিতে গেলো আশার।

আশা বললো–তুমিই খোলো কিন্তু চাবি ঠিক উল্টো দিকে প্যাঁচ দেবে।

জাভেদ আদেশ পালন করলো।

চাবিটা নিয়ে জাভেদ আশার কথামত উল্টোদিকে প্যাঁচ দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুকের ঢাকনা খুলে গেলো।

জাভেদ অবাক হয়ে দেখলো সিন্দুকের তলদেশে একটা সুড়ঙ্গপথ।

আশা বললো–আমাকে ঐ সুড়ঙ্গ পথে নিয়ে যেতে পারবে?

পারবো।

জাভেদ, আশার হাত ধরে সিন্দুকটার মধ্যে প্রবেশ করলো। সুন্দর সিঁড়ির ধাপগুলো ক্রমান্বয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে।

জাভেদ আশার হাত ধরে নামিয়ে নিয়ে চললো।

কিছুটা নামতেই সুড়ঙ্গপথ বন্ধ। আর কোনো পথ নেই।

জাভেদ বললো—-পথের শেষ।

হাসলো আশা।

জাভেদ বললো–এখন উপায়, এবার ফিরে যেতে হবে?

না, ফিরে যেতে হবে না। আশা হাতড়ে দেয়ালের গায়ে একটা বোতামে চাপ দিলো।

অমনি দেয়ালখানা সরে গেলো একপাশে।

জাভেদ বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো সুড়ঙ্গের মধ্যে দেয়ালের ওপাশে অতি সুন্দর গুহা। আলো ঝলমল করছে, আলোর উজ্জ্বলতায় গুহার দেয়ালে মনিমুক্তার কারুকার্য ঝ ম করছে।

জাভেদ মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলো সব কিছু।

আশা বুঝতে পারলো ভারী অবাক হয়েছে জাভেদ, তাই সে নির্বাক। বললো আশা–ভাবছো মাটির নিচে এমন আলো এলো কোথা থেকে?

হাঁ, সে কথাই ভাবছি আমি, আর ভাবছি কত মনিমুক্তা তোমার যা দিয়ে দেয়ালে কারুকার্য করেছে।

হেসে বললো আশা–স্বয়ং দস্যু বনহুরের সন্তান তুমি, তোমার পিতার মনিমুক্তাহীরা সোনা দানার চেয়েও কি আমার বেশি?

তা জানি না তবে দস্যু বনহুরের গুহার দেয়ালে কোনো মনি মুক্তাহীরা কাঞ্চন খচিত নয়।

যাক এসো।

আশা এগুলো।

জাভেদ, বললো–যা দেখছি তাতেই আমি সম্বিৎহারা হয়ে পড়েছি …

জাভেদ এসব তোমার।

না, ও সবে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

জাভেদ, বনহুরকে আমি এসব দেখিয়েছি। আশ্চর্য মানুষ সে, লোভ লালসা মোহ কিছু নেই তার। তুমিও তাই বলতে চাও।

আশা আম্মু এ সব দিয়ে আমি কি করবো?

সব তোমার, তুমি যা খুশি তাই করবে। এসো আরও দেখবে এসো।

জাভেদের হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে আশা এগুতে লাগলো। সুন্দর অপরূপ নানা ধরনের মূল্যবান সামগ্রী থরে থরে সাজানো। রৌপ্য আসন, কতকটা সিংহাসনের মত দেখতে। দুপাশে দুটি রৌপ্যমূর্তি চমর হাতে দন্ডায়মান। সিংহাসনটির ঠিক মাথার কাছে দেয়ালে একটি স্বর্ণমূর্তি ঠিক কোনো নর্তকীর ড্রেস পরিহিতা।

জাভেদ অবাক হয়ে দেখছে।

আশা বললো–এটি আমার দরবার কক্ষ। আসনটার উপরে যে স্বর্ণ মূর্তি দেখছো ওটা আমার মূর্তি।

আশা আম্মু তুমি কুটিরে বাস করো অথচ....

হাঁ, আমি এই ঝম জংগলের একচ্ছত্রী রাণী ছিলাম। আমার অনুচর ছিলো আড়াইশত কিন্তু কেউ কোনো দিন পৃথিবীর আলো দেখেনি।

তার মানে।

সে এক কাহিনী।

তুমি না বলেছিলে বলবে তোমার জীবন কাহিনী?

আমার জীবনের অনেকগুলো দিক আছে, সবগুলো নিয়ে তোমাকে বলব।

না, তোমাকে আজকেই বলতে হবে? জাভেদের কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

বললো আশা–বেশ, আজই বলবো, এসো আমার সঙ্গে।

জাভেদ এগুলো, দুচোখে তার বিস্ময়। যত দেখছে ততই আশ্চর্য হচ্ছে সে।

একটা গুহায় এসে দাঁড়ালো আশা।

বললো–এখানে দুটো আসন আছে?

হাঁ আছে। বললো জাভেদ।

ওর একটাতে বসো জাভেদ। বললো আশা।

আশা কোনো সময় জাভেদকে তুই আবার কোনো সময় তুমি বলতো। অবশ্য যখন বেশি খুশি হতো তখন তুই আর যখন স্বাভাবিক থাকতো তখন তুমি বলতে। জাভেদ এবার আশাকে একটি আসনে বসিয়ে দিয়ে বললো–বলো এবার তবে। হাঁ, যা জিজ্ঞাসা করবে তারই জবাব দেবে। আচ্ছা বলল, ভূগর্ভে তোমার এত বড় আস্তানা কিন্তু কোনো অনুচর বা দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখলাম না?

আশা একটু হেসে বললো–এই ভূগর্ভ আস্তানা বা সুড়ঙ্গপথ গুহাটা একদিন ছিলো এক জলদস্যুর—-

চমৎকার তোমার কাহিনীর শুরু আশা আম্মু! বলো তারপর?

জলদস্যুটার নাম ছিলো হাওড়। সে অতি ভয়ংকর ছিলো। চেহারা ভীষণ কুৎসিত, মুখের এক অংশ বাকা ছিলো, নাকের কিছু অংশ ছিলো না, তার জন্য তার বৃহৎ আকার দাঁতগুলো সব সময় জিভের উপর দিয়ে বেরিয়ে থাকতো। চেহারার মতই ভয়ংকর তার মন ছিলো, সব সময় কোমরের বেল্টে থাকতে সবচেয়ে ভারী পিস্তল। তার অনুচর ছিলো, সব সময় তারা ছিপ নৌকা নিয়ে সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করে বেড়াতে এবং যে কোনো জাহাজের উপর হামলা চালিয়ে হত্যাকান্ড চালাতো ও লুটতরাজ করতো। সোনাদানা মণিমুক্তা আর কোটি কোটি টাকা তারা উপার্জন করতো, তারপর তারা ফিরে আসতে ঝাম জঙ্গলে।

তারপর?

এই জঙ্গলেই ছিলো তাদের বিশ্রাম স্থান এবং এই ভূগর্ভ সুড়ঙ্গগুহাই তাদের আস্তানা, যেখানে আমরা বসে আছি। এই যে মণিমুক্তাখচিত দেয়াল দেখছো সব সেদিনের করা, জলদস্যু হাওড়ের তৈরি…

আশা আম্মু তুমি তাহলে...

হ্যাঁ, আমি তোমাকে বলবো। তোমার পিতার কাছেও আমি আমার জীবন কাহিনী বলছি কিন্তু সে আর একটা দিক। জাভেদ, আমি পূর্বেই তোমাকে বলেছি বনহুরের কাছে আমার যেদিক নিয়ে বলেছি, তোমাকে বলছি অপর একটা দিক নিয়ে।

আশ্চর্য তোমার জীবন কাহিনী। দেখছি এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

হ্যাঁ, বিস্ময়কর বটে।

হাওড় আমাকে ধরে আনে সবার অলক্ষ্যে, এনে আমাকে কোনো এক গোপন বন্দীশালায় বন্দী করে রাখে। হাওড় ভেবেছিলো বন্দী করে এনে সে নিজের আয়ত্তে নেবে আমাকে কিন্তু সে পরাজিত করলো। কারণ আমাকে যখন পাকড়াও করে আনলো তখন আমি ছোট্টটি নই, বেশ বড়, সব বুঝতে শিখেছি।

তারপর?

হাওড় আমাকে আয়ত্তে আনার জন্য আমার উপর চালালো নির্মম অত্যাচার নিষ্পেষণ, তবু সে আমাকে আয়ত্তে আনতে পারলো না। আমি সর্বক্ষণ ঈশ্বরের ধ্যানমগ্ন থাকতাম। তবুও রেহাই পেলাম না, আমাকে দিয়ে ওরা ব্যবসা শুরু করলো, বড় বড় মহাজনদের আসরে আমাকে নাচতে হবে। তবুও খুশি হলাম, হয়তো এবার রেহাই পাবো। যাক তবু কিছুটা নির্যাতন হাল্কা হলো। হাওড় আমার নাচ দেখিয়ে মোটা অর্থ উপার্জন করতে লাগলো। আমি একদিন পাকা নর্তকী বনে গেলাম কিন্তু শান্তি ছিলো না আমার মনে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁপিয়ে উঠলাম, বিশেষ করে একজন সঙ্গীর আশায় মন অস্থির হয়ে উঠলো। জানো জাভেদ, এমন কোনো সাথী ছিলো না যার সঙ্গে আমি কিছুক্ষণ বসে আলাপ করি। সঙ্গী–সাথীহীন অবস্থায় নানা চিন্তা ভাবনা ঘুরপাক খেতে আমার মাথায়। আমাকে যখন বাইরে নিয়ে যেতো তখন আমার চোখ মজবুত করে কালো কাপড়ে বেঁধে দিতো, তাই সুড়ঙ্গ পথ আমার অচেনা রয়ে যেতো, পালাতে পারতাম না। যদিও সুযোগ পেলেই পালাতে চেষ্টা করতাম। হাওড় যখন দলবল নিয়ে চলে যেতো তখন আমি একা থাকতাম এই ভূগর্ভের আস্তানায়। অবাক হয়ে দেখতাম, কত বিস্ময়ভরা মণিমুক্তাখচিত এই সুড়ঙ্গগহ্বর। জানি কোনো নিপুণ কারিগার দ্বারা তৈরি এই গহ্বরটা। একদিন জানতে পারলাম এই ভূগর্ভ গহ্বর হাওড়ের

তৈরি নয়। এখানে বাস করত এক মহারাজা, সে চব্বিশ বছর ধরে এই গহবর দক্ষ কারিগর দ্বারা তৈরি করেছিলেন এবং নির্জনে বাস করতেন।

জাভেদ অবাক কণ্ঠে বললো–মহারাজা এখানে বাস করতেন। কিন্তু তাকে এভাবে ভূগর্ভে আস্তানা তৈরি করে নিতে হয়েছিলো কেন?

সে কাহিনী আমার অজানা। হয়তো সে কাহিনী আরও বিস্ময়কর।

তা হতে পারে। জাভেদ চারদিকে নিপুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে বললো–কত বড় দক্ষ কারিগর দ্বারা এই ভূগর্ভ গহ্বর তৈরি হয়েছে যেখানে অনায়াসে পৃথিবীর আলো প্রবেশে সক্ষম হয়েছে।

হাঁ, সে কথা পরে বলছি শোনো।

বলো?

হাওড় যখন একা রেখে চলে যেতো তখন আমি সব ঘুরে ঘুরে দেখতাম, পালাবার পথও খুঁজতাম অতি সাবধানে। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগতো ওরা চলে যাবার পর একজনও এই ভূগর্ভ গহ্বরে থাকতো না। আমি তখন সম্পূর্ন স্বাধীন থাকতাম। যদি পালাবার পথ পেতাম তাহলে আমি বহু মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে সরে পড়তাম। সেদিন ভাবিনি একদিন এ সব আমার হবে। এই সব মূল্যবান মণিমুক্তা হীরা দেখে আমার বড় লোভ হতো, ভাবতাম যদি এগুলোর কিছু আমি পেতাম তাহলে জিন্দেগী ভর আমি রাণীর হালে থাকতে পারতাম......বলে হাসলো আশা। তারপর বললো–হা যা বলছিলাম শোনো, ওরা আমাকে একা রেখে চলে গেলে আমি নানা কথা ভাবতাম। কেমন করে ওদের কবল থেকে রক্ষা পাবো– একদিন আমার মাথায় নতুন এক বুদ্ধি এলো, ভাবলাম যখন ওরা ফিরে আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হবে তখন সেই গুহা বা গহ্বরের দরজা যদি বাইরে থেকে কোনো ক্রমে বন্ধ করে দিতে পারি তাহলে আর কিছুতেই বের হতে পারবে না। সারা জীবন চেষ্টা করলেও আর দরজা খুলতে পারবে না।

তার মানে?

মানে দরজাটা একটা বৃহৎ আকার পাথর দিয়ে তৈরি এবং তা বাইরে থেকেই বন্ধ করা যায় কিন্তু ভিতর থেকে তা খোলার কোনো উপায় নেই। দরজা বন্ধ করার কৌশল আমি জানতাম, আরও জানতাম ভিতর থেকে খোলার কোনো

উপায় নেই। সেদিন আমার ভীষণ আনন্দ লেগেছিলো মনে, এতো সহজ উপায় থাকতে আমি এতদিন এমনিভাবে কাটিয়েছি?

তারপর?

তারপর আমি সময় এবং সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। একদিন হাওড় ফিরে এলো দস্যুতা করে। রাশি রাশি মূল্যবান সামগ্রী এনেছে তারা, আনন্দে আত্মহারা। খুব করে মদ পান করছে আর নানা রকম কুৎসিত কান্ডকারখানা। সবাই ঐ গহ্বরে বসে সুরা পান করে চলেছে। নেশায় ভরপুর। আমাকে ওরা নাচতে বললো। বিশেষ করে হাওড় আমাকে শংকর মাছের চাবুক মারতে মারতে নিয়ে গেলো সেই গুহার মধ্যে। আমি কোনো আপত্তি না করে নাচ দেখাতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাওড় আর তার দলবল চরম মাতালে পরিণত হলো তখন আমি আলগোছে বেরিয়ে এলাম। হাওড় কিন্তু সহজে মাতাল হয়নি সে টছিলো, আমাকে বেরিয়ে যেতে দেখে বললো–কোথায় যাচ্ছিস পিয়ারী। হাওড় আমাকে পিয়ারী বলতো। আমি বললাম, এক্ষুণি আসছি। বলেই বেরিয়ে এলাম। বুঝতে পারলাম হাওড়ও আমার পিছু পিছু আসছে। আমি মুহূর্ত বিলম্ব না করে বাইরে বেরিয়ে এসেই দরজার পাশে হ্যান্ডেলের সুইচ টিপে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ আওয়াজ করে পাথরের দরজাখানা বন্ধ হয়ে গেলো।

আমার কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই জাভেদ হর্ষধ্বনি করে উঠলো। খুশিতে সাবাস বলে উঠলো সে চিৎকার করে। মনে হলো এই বুঝি আশা কাজটা সমাধা করলো। তারপর বললো–বলো আশা আম্মু তারপর?

তারপর কেটে গেছে বিশটি বছর।

দরজা বন্ধ করার পর আর খোলোনি?

না।

তারপর কি হলো দেখলেও না একবার?

দেখতে ইচ্ছা হলেও দেখিনি, কারণ হাওড়ের মুখ আর আমি দেখতে চাইনি।

কিন্তু ওরা যে সত্যিই ঐ গহ্বরে ছিলো বা আছে তার কোনো সঠিক সন্ধান পেয়েছিলে?

হাঁ, কারণ প্রতিদিন আমি ঐ পাথরের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম। শুনতে পেতাম ওপাশে আর্তনাদ–একদিন দুদিন তিনদিন চতুর্থ দিনে ও পাশে আর্তকণ্ঠ আর স্পষ্ট শোনা গেলো না। পঞ্চমদিন এবং ষষ্ঠ দিনেও সামান্য গোঙানির আওয়াজ পেয়েছি তারপর আর কোনো শব্দ শুনতে পাইনি।

বললো জাভেদ–ঐ গুহায় বা গহ্বরের আর কোনো দরজা বা জানালা ছিলো?

না।

কোনো দরজা বা জানালা অথবা কোনো পথ ছিলোনা বাইরে বের হবার। এই একটিমাত্র পথই ছিলো।

কোনো খাদ্যদ্রব্য ছিলো কি যা খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে।

ছিলো তবে প্রচুর নয়, সামান্য কয়েক বোতল মদ আর ছিলো কিছু মাংস ও ফলমূল। সামান্য ফল ও মাংস, আর সংখ্যায় চল্লিশ জন ছিলো

আশা আম্মু, আজ আমি ঐ গহ্বরের পাথরের দরজা খুলে দেখতে চাই সেই বিশ বছর আগে তোমার আটকে রাখা জলদস্যুদের কি অবস্থা হয়েছে।

বেশ, তোমাকে অনুমতি দিলাম কিন্তু বড় আফসোস, আমি দেখতে পাবে না, কারণ আমি আজ অন্ধ। আশা উঠে দাঁড়ালো, তারপর দেয়াল হাতড়ে চললো সে সুইচটার পাশে।

জাভেদ তাকে সাহায্য করলো।

আশা সুইচে হাত দিয়ে কৌশলে হ্যান্ডেল ঘুরালো, সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দ করে ভৌতিক গহ্বরে পাথরের দরজা খুলে গেলো।

জাভেদ আর আশা হঠাৎ অদ্ভুতভাবে চিৎকার করে উঠলো, তারপর সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো।

একটি ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ালো জাভেদ আর আশার পাশে।

[পরবর্তী বই ভৌতিক গহ্বর]